Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমকালীন পত্রিকায় নজরুল : কবিতার পাঠভেদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.3
Pages	64-138
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমকালীন পত্রিকায় নজরুল : কবিতার পাঠভেদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

সৌমিত্র শেখর*

সাহিত্যে পাঠভেদ বা পাঠান্তর ঘটে থাকে। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রচনারও প্রথম পাঠ থেকে পুনর্মুদ্রিত অন্য পাঠগুলোর মধ্যে নানা পার্থক্য চোখে পড়ে। পাণ্ডুলিপি থেকে যখন সাময়িকীতে কিংবা সাময়িকীতে প্রকাশিত কোন রচনা যে সময় গ্রন্থভুক্ত হয় অথবা একই গ্রন্থের যখন চলে বিভিন্ন সংস্করণ – কখনো লেখক কর্তৃক আবার কখনো অন্য কোনভাবে এই পরিবর্তনগুলো ঘটে। যদি পরিবর্তনটা ব্যাপকভাবে ঘটে তবে সহজেই তা দৃষ্টিগোচর হয়। আর যদি ওই পরিবর্তন খুবই ছোট হয়, বিশেষ করে তা শব্দ বা বাক্যাংশেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে অনুসন্ধানী পাঠক-গবেষক সেটা আয়াস স্বীকার করে আবিষ্কার করেন। এই পাঠ পরিবর্তন-যাকে পাঠান্তর বা পাঠভেদ বলা হচ্ছে—গ্রন্থকার কর্তৃক যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে এর 'মোটিভ' যেমন এক রকম হয়, আবার যদি তা গ্রন্থকার ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে ঘটে থাকে তার 'মোটিভ' কিন্তু আলাদা হতে বাধ্য। এই পার্থক্যই একজন পাণ্ডুলিপি গবেষকের বা ভাষাতাত্ত্বিকের বিশেষ আগ্রহের বিষয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কোন রচনাকে 'প্রথম প্রকাশ' বলে মনে করার একটি সাধারণ রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু তার আগে ওই লেখাটি সাময়িকীতে ছাপা হয়তো হয়েছে এবং অবশ্যই রচিত হয়েছে তারও আগে। মাঝখানে যেহেতু থাকে সময়ের ব্যবধান, সেহেতু একথা মনে করে নেয়াই সঙ্গত যে, এর ফলে লেখকের চিন্তা ও বোধেরও পরিবর্তন-বিবর্তন ঘটতে পারে। পাঠভেদে বা পাঠান্তর আলোচনা প্রসঙ্গে কিন্তু এর পরিচয় অনেকটা আবিষ্কার করা সম্ভব। এ কারণে লেখকের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি বিশেষ মূল্যবান। মূল পাণ্ডুলিপির অভাবে কোন রচনার প্রথম মুদ্রিত পাঠই কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহল-উদ্দীপক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, রচয়িতা যদি হন কাজী

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নজরুল ইসলাম - তাঁর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। নজরুল ইসলাম তাঁর কিছু লেখা লিখেই পাঠিয়ে দিয়েছেন পত্রিকার দপ্তরে, অথবা সম্পাদক-প্রকাশকদের অনুরোধে তাঁকে এক বৈঠকেও লিখতে হয়েছে।[১] অন্য লেখকদের ক্ষেত্রে সাধারণত যেমন হয়, লিখে ফেলে রাখা কিছু দিন, তারপর ভাবনা-চিন্তা করে পরিমার্জন এবং তারও পরে প্রকাশ - নজরুলের জীবনে কিন্তু ঘটেছে এর ঠিক উল্টো। তাঁর পরিমার্জনা বা পরিযোজনা যা-কিছু তা-ও লেখার পরপরই, অনেকটা তাৎক্ষণিক। অন্যদের মতো তাঁকে লেখা ফেলে রাখতে হয়নি। তাই নজরুলের রচনার প্রথম মুদ্রিত পাঠ তাঁর পাণ্ডুলিপির মতোই আগ্রহব্যঞ্জক। নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালে প্রকাশিত বেশ কিছু পত্রিকায় নিয়মিত, কখনো অনিয়মিতভাবে লিখেছেন। এ-গুলোর মধ্য থেকে বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'নারায়ণ' (১৩২১), 'মোস্‌লেম ভারত' (১৩২৭) ও 'বাঙ্গলার কথা'য় (১৩২৮) মুদ্রিত তাঁর কবিতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। কারণ 'নারায়ণ', 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদক ও পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে নজরুলের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ছিলো। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, তিনি ছিলেন তিনটি পত্রিকারই প্রধান লেখকদের একজন। ফলে নির্দিষ্ট পত্রিকার জন্যেই হয়তো তাঁকে একটি লেখা লিখতে হয়েছে, অবলম্বন হয়তো কোন সমসাময়িক ঘটনা। অথচ দেখা গেছে, সেই লেখাই পরবর্তীকালে লাভ করেছে সর্বজনীনতা। 'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটির কথা বলা যায়, 'মোস্‌লেম ভারতে' প্রকাশিতব্য একটি চিত্রের ক্যাপ্‌শান লিখতে গিয়ে তিনি ওই অনিন্দ্যসুন্দর কবিতাটি রচনা করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে বৃটিশ শাসকশ্রেণী গ্রেফতার করলে (১০ ডিসেম্বর ১৯২১) বাসন্তী দেবীর অনুরোধে 'বাঙ্গলার কথা'র জন্যে এক বৈঠকে নজরুল লিখলেন 'ভাঙার গান' কবিতা। যে-কোন কালে অবরুদ্ধ অবস্থায় মুক্তিপাগল মানুষের জন্যে কবিতাটি কত জরুরি! এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী গ্রেফতার হলে লিখিত 'অভয় মন্ত্র' কবিতাটির কথাও স্মরণ করা যায়। আর তাই নজরুল ইসলামের প্রথম মুদ্রিত রচনার পাঠ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অপরিহার্য। 'নারায়ণ', 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'বাঙ্গলার কথা'য় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলোকে পাণ্ডুলিপির মতোই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থে ও গ্রন্থের সংস্করণে এগুলোর যে পাঠভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাই এখানে মূলত অনুসন্ধান করা হয়েছে, এর কার্যকারণ বিবেচনা

১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্যে দ্রষ্টব্য : মুজফ্‌ফর আহমদের কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা গ্রন্থের 'ভাঙার গান' শীর্ষক অংশ।

বা প্রয়োজনীয়তা বিচার নয়। মূল বিষয় উপস্থাপনের আগে পত্রিকা তিনটির পরিচয় প্রদান আবশ্যক।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' ও মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোস্‌লেম ভারত' মাসিক পত্রিকা দুটো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকার নামানুসারে লেখকগোষ্ঠীর পরিচয় চিহ্নিত হতে দেখা যায়। এ মাসিক দুটো সে অর্থে কোন গোষ্ঠী হয়তো গড়ে তুলতে পারেনি, কিন্তু সমকালে যে বলিষ্ঠ সাহিত্য-ধারার বাহক ছিলো এই 'নারায়ণ' ও 'মোস্‌লেম ভারত' তা ইতিহাসে সতত উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। 'নারায়ণ' রবীন্দ্র-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলো সে সময়। চিত্তরঞ্জন দাশের গান্ধীবাদী রাজনৈতিক দর্শন ও সাহিত্যমতের প্রতিফলন ঘটে এখানে। কাজী নজরুল ইসলাম এর প্রকাশকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কারণ, 'নারায়ণ' যখন প্রকাশিত হয়, তার অনেক পরে লেখক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে তিনি যখন পত্রিকাটিতে লেখালেখি শুরু করেন, তারপর থেকেই হয়ে ওঠেন এর প্রধান লেখকদের একজন। অন্যদিকে 'মোস্‌লেম ভারতে'র জন্মলগ্ন থেকে নজরুল এর প্রধান লেখক। প্রতিষ্ঠিত কবি ও সম্পাদক মোজাম্মেল হকের পাশাপাশি নবীন লেখক নজরুল ইসলাম 'মোস্‌লেম ভারতে'র প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে পক্ষপাত না থাকলেও পত্রিকাটি কখনো ইংরেজ তোষণ যেমন করেনি, তেমনি এতে প্রকাশ পায়নি স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা। 'বাঙ্গলার কথা' সেদিক থেকে বেশ ব্যতিক্রমী একটি পত্রিকা। অল্প কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েছে, কিন্তু সর্বাংশে রাজনৈতিক ছিলো এ সাপ্তাহিকটি। চিত্তরঞ্জন দাশ এর সপাদক ছিলেন, পরে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে সম্পাদনার ভার বহন করতে হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তী দেবীর সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের অনেকটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিলো। নজরুলকে বাসন্তী দেবী পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রচিত শোক-বিহ্বল নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'চিত্তনামা' তিনি বাসন্তী দেবীকে উৎসর্গ করে লিখেন : 'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে—নজরুল ইসলাম'। মোট পাঁচটি কবিতার সমন্বয়ে 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে 'ইন্দ্রপতন' কবিতাটি সুদীর্ঘ। এই কবিতা তিনি লিখেন হুগলিতে, ১১ আষাঢ় ১৩৩২। এখানে দেশবন্ধুকে তিনি নবীদের সঙ্গে তুলনা করেন। ফলে ধর্মান্ধ মুসলিমদের দ্বারা নজরুল কঠোরভাবে সমালোচিত হন। এ প্রসঙ্গে চৌধুরী শামসুর রহমানের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামও 'ইন্দ্রপতন-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ কবিতায় পরলোকগত নেতার প্রতি তাঁর অন্তরের আবেগময় অর্ঘ্য নিবেদন করেন। যতদূর মনে পড়ে, তৎকালীন বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়ই নজরুলের এই সুদীর্ঘ কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। তাঁর এই কবিতা নিয়ে মুসলিম সমাজে বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি হয়, এবং দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখে আমি প্রত্যক্ষভাবে এই বিতর্কের সাথে নিজেকে জড়িত কোরে ফেলেছিলাম। কবি তাঁর এ কবিতায় মহান নেতার গুণকীর্তন করতে গিয়ে তাঁকে নবীদের সাথে তুলনা কোরে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বোলে ফেলেছিলেন - 'তুমি হে মানব-আম্বিয়া' তা' ছাড়া কবিতাটিতে এমন আরো কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ইসলামী ভাবধারার অনুকূল নয়। কবির প্রতি 'খোলা-চিঠিতে' আকারে লেখা আমার প্রবন্ধে এসব ত্রুটির প্রতি আমি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। পরে যখন কবিতাটি তাঁর চিত্তনামা বইয়ে প্রকাশিত হয় তখন আপত্তিকর লাইনগুলি সংশোধন কোরে এবং কোন কোন লাইন বাদ দিয়েই তা ছেপেছিলেন।[২]

এই বিব্রতকর বির্তক এড়াতে নজরুল ইসলাম পরবর্তীকালে যে পঙ্‌ক্তিগুলো বর্জন করতে বাধ্য হয়েছিলেন সেগুলো হচ্ছে :

জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে, হে পুরুষবর !
কোরানে ঘোষিত তোমার মহিমা, হতে পয়গাম্বর।
যে জ্যোতি পারে নি সহিতে স্বয়ং মুসা-ও কোহ্-ই-তুরে,
সেই জ্যোতিঃ তুমি রেখেছিলে তব নয়ন-মণিতে পুরে।[৩]

অতএব, বুঝা যাচ্ছে কি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি কাজী নজরুল ইসলামের। চিত্তরঞ্জন দাশের ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক মতাদর্শ নজরুলকে যেমন আকৃষ্ট করেছিলো, নজরুলও তেমনি স্বীয় গুণাবলির জন্যেই ওই মহান নেতা ও তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবীর স্নেহ লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে 'নারায়ণ', 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'বাঙ্গলার কথা' কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ছিলো গভীর। আর এই সম্পর্কের গভীরতা কিন্তু লেখালেখির মাধ্যমেই সৃষ্টি।

---

২ চৌধুরী শামসুর রহমান, *পঁচিশ বছর,* ১৯৫৮, লিবার্টি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪২-৪৪

৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড,* নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯০৩

নারায়ণ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় ১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'নারায়ণ' 'মাসিকপত্র ও সমালোচনা' হিসেবে প্রকাশ পায়। এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন চিত্তরঞ্জন-ভ্রাতা সুকুমার দাশ। কলিকাতার কালীঘাটস্থ ১৪৮নং সাউথ রসা রোড অফিস থেকে রমেশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও বিজয়া প্রেসে (২০নং পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা), 'নারায়ণ' মুদ্রিত হতো। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় একটি কবিতা, একটি গল্প (কোনটিরই রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয়নি), একটি ভ্রমণকাহিনীসহ মোট নয়টি রচনা স্থান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই তত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধ। বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রাথ শীল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধায়, জলধর সেন, সরযূবালা দাসগুপ্তের রচনায় সমৃদ্ধ সংখ্যা। কোন সম্পাদকীয় নিবেদন নেই। তবে 'স্তব' শিরোনামে যে রচনাটি প্রথমেই মুদ্রিত হয়েছে তাকে সম্পাদকের কথা হিসেবে ধরা যায়। এই স্তবে জগতের জীবশ্রেষ্ঠ 'মানুষ'কে 'নরনারায়ণ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং এই 'নর'রূপী 'নারায়ণ'ই পত্রিকাটির মুখ্য উপাস্য হিসেবে ঘোষিত! এর চতুর্থ সংখ্যা থেকে কার্যালয় পরিবর্তিত হয়ে ২০৮/২/ডি কর্নওয়ালিস্ স্ট্রিটে চলে আসে! তারপর, নানা ঠিকানায় কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে। 'নারায়ণে'র বার্ষিক মূল্য ছিলো সাড়ে তিন টাকা, প্রতি সংখ্যার সাধারণ দাম পাঁচ আনা।

অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পাঁচটি বছর পত্রিকা পরিচালনার পর ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ সংখ্যায় যে 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশটি প্রকাশ পেয়েছে তাতে আরও ভালোভাবে পত্রিকার চারিত্র্য ফুটে উঠেছে। আজকের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তাই নিবেদনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি :

'সম্পাদকের নিবেদন'

> 'নারায়ণ'—৫ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা বাঙ্গলার সাহিত্যসেবীদের নিকট বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া আসিতেছি। অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিদ বাদানুবাদের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে! এই কালের মধ্যে বাঙ্গলায় সাহিত্য ও জীবনে একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে। নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও বাঙ্গলা আবার

> তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালীর জীবন ও সাহিত্যকে আমরা স্ব-ভাবে ফিরাইয়া আনিতে চাহি। কৃত্রিমতা ও সর্ব্ব প্রকার পরাণুকরণের মোহ, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে, আমাদের জীবনকে বিষে জর জর করিয়া দিয়াছে। বিষ পরিপাক হয় না। পাশ্চাত্যের বিষয় আমাদের গত শতাব্দীর সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কাজেই এক শ্রেণীর সাহিত্য ও জীবনকে আমরা 'নারায়ণে'র পৃষ্ঠায় প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করি নাই, ভীতও হই নাই। আমাদের জীবন স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া না আসিলে, সাহিত্য কি করিয়া স্বাভাবিক হইবে? সাহিত্য ত জীবন ছাড়া নয়। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনকে তাহার স্বভাবধর্ম্মে ফিয়াইয়া আনিয়া দিবে, এত বড় জীবন ত আর দেখি না। তথাপি আমাদের ভিতরে ও বাহিরে এই নবজাগরণের চাঞ্চল্যকে অস্বীকার করিব কিসের স্পর্দ্ধায়? কেহ আসিবেন – কিছু ঘটিবে, যাহাতে বাঙ্গলার স্ব-রূপ রূপে ও সুরে আবার দেখা দিবে। এই আশায় এই অকিঞ্চনেরা সাহিত্যের তপোবনের এক পার্শ্বে বসিয়া সন্তর্পণে অপেক্ষা করিতেছে।

প্রথম দিকে নানা সমস্যায় পতিত হয়েও দিকভ্রান্তির চোরাবালিতে হারিয়ে যায়নি 'নারায়ণ'। সাহিত্য ও দেশ-সমাজ সেবার যে যুগপৎ ব্রত পত্রিকাটি গ্রহণ করেছিলো সে অনুসারেই পরবর্তী সময় নানা বিভাগ স্থান পেয়েছে এতে। প্রকাশিত গ্রন্থ-পত্রিকার সমালোচনা থেকে শুরু করে অন্য পত্রিকা বা সাময়িকীতে প্রকাশিত ভালো রচনার পুনর্মুদ্রণের জন্যেও বিভাগ খোলা হয়েছিলো এতে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভ্রমণ এমন কোন দিক ছিলো না যা 'নারায়ণে' স্থান পেতো না। তৎকালীন বিখ্যাত বহু মনীষী এই পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো কথাশিল্পী জনপ্রিয়তার শিখরে থেকেই লিখেছেন এই পত্রিকায়। তাছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, দেবেন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন 'নারায়ণের' নিয়মিত লেখক। কজী নজরুল ইসলামও হয়ে উঠেছিলেন এঁদের একজন, তবে তা পত্রিকাটির মধ্য পর্যায় থেকে। কারণ ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নজরুল ইসলাম লেখক হিসেবে আবির্ভূত হবার আগেই পত্রিকাটি অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ছয়টি বছর অতিক্রম করে। ষষ্ট বর্ষ দশম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২৭) 'নারায়ণে' 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকা আলোচনা প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের,

'বাঁধনহারা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে তিনি পত্রিকাটিতে লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর লেখা 'নায়ারণে'র পরিচালকবর্গ ও পাঠকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মোস্‌লেম ভারত

"মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটীকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বাণীকে Motto হিসেবে মুদ্রিত করে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'মোস্‌লেম ভারত' সচিত্র মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ টাকুরের উল্লিখিত বাণীটি পরবর্তী প্রতিটি সংখ্যায় মুদ্রিত হতে দেখা যায়। তবে পত্রিকার ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা 'মহরম সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশ পাওয়ায় সেই সংখ্যায় 'যে পর্যন্ত কোন জাতি তাহাদের পরিবর্ত্তন না করে, সে পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তাহাদের (কোন) পরিবর্ত্তন করেন না।"—কোরানের 'রায়াদ' সুরার এই অংশটুকু রবীন্দ্রনাথের বাণীর উপরে ছাপা হয় এবং পরবর্তী প্রতিটি সংখ্যাতেই এই ধারা অনুসৃত হতে থাকে। লক্ষণীয়, উক্ত সংখ্যা থেকে আরবি মাসের নামও উল্লেখ করা হয় এবং তা বাংলা মাসের উপরে মুদ্রিত হতে থাকে।

শান্তিপুর নিবাসী কবি মোজাম্মেল হক্ ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক এবং প্রকাশক ছিলেন কবিপুত্র আফজালুল হক। কলিকাতার ৩নং কলেজ স্কয়ারে কবির 'মোস্‌লেম পব্লিশিং হাউস্' নামে একটি পুস্তক বিপণী ছিলো এবং ওই ঠিকানা থেকেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। সমকালীন অনেকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, পত্রিকার সম্পাদক যদিও ছিলেন মোজাম্মেল হক্, কিন্তু এর সব কাজই করতেন তাঁর প্রকাশক-পুত্র নিজে।

'মঙ্গলাচরণ' নামে একটি কবিতা দিয়ে প্রথম সংখ্যা 'মোস্‌লেম ভারতে'র সূচনা, লেখকের নাম অনুল্লিখিত। অনুমান করা যায়, কবিতাটির রচয়িতা সম্পাদক স্বয়ং। কবিতা রচনার মাধ্যমে ঈশ্বরের বন্দনা এবং পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়েছে। 'মোস্‌লেম ভারতে'র এই সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় ('আমাদের কথা' শিরোনামে) প্রকাশিত হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন পত্রিকাটি প্রকাশ করা হলো, এর উদ্দেশ্য ও কর্মসুচির আলোচনা আছে এতে ; পত্রিকাটির চারিত্র্য বিবেচনায় অবশ্য

জরুরি মনে করে এর অংশ-বিশেষ তুলে ধরা হলো :

> আমাদের এই উত্থান প্রয়াসী পতিত সমাজের কর্ণে এই সময়ে মোস্‌লেমের গৌরব-কাহিনী, মোস্‌লেমের প্রজ্ঞা, প্রভাব, পুণ্যকথা প্রভৃতির সুর-লহরী ঢালিয়া দিতে পারিলে, এক কথায় মুসলমানের অতীতের সম্বল, বর্ত্তমানের সঙ্কট এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমুজ্জ্বল ছবি তাহাদের নয়ন-সমক্ষে ধরিতে পারিলে, অথবা দুটা উৎসাহের কথা বলিলেও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। সেই আশায় আশ্বস্ত হইয়াই-সেই শুভ উদ্দেশ্যের কামনা করিয়াই আজ আমরা আমাদের বড় সাধের 'মোস্‌লেম ভারত'কে আমাদের সাহিত্যক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি।
>
> আর একটি কথা। বর্ত্তমানে 'আমাদের সাহিত্যিক সমাজ' বলিলে কেবল মুসলমান সমাজকেই বুঝাইবে না, পরন্তু বঙ্গদেশবাসী বঙ্গভাষাভাষী হিন্দু-মুসলমান মানবসঙ্ঘকেই বুঝাইবে। হউক হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন আর মুসলমানের ধর্ম্ম অন্য, কিন্তু জন্মভূমিগত এবং ভাষাগত হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক - উভয়েই একই প্রকৃতির নিয়ম-নিগড়ে নিবদ্ধ। পূর্ব্বে বাঙ্গালী মুসলমানগণ বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা ও কার-কারবার করিলেও বঙ্গভাষাকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে নিজের সম্পদ করিয়া তুলিবার জন্য আদৌ মনোযোগী ছিলেন না ; বরং বাঙ্গলা ভাষাকে একটু ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। কিন্তু আজকাল সেভাব আর নাই—সেই ভ্রম এখন সকলে ঘুচিয়াছে। আজ মুসলমানগণ বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছেন, এমন কি অন্দর মহলের ভিতরেও বঙ্গভাষার স্বর্ণ-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ মুসলমানগণ মনে প্রাণে বুঝিয়াছেন যে, হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে হইলে বাঙ্গলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

সম্পাদকীয় বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, 'বঙ্গ-জননীর যুগল সন্তান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্মিলন' স্থাপন ছিলো পত্রিকাটির একটি প্রধান লক্ষ্য। অবশ্য মুসলিম সমাজের 'ভূতলাবলুণ্ঠিত' অবস্থায় 'একগাছি যষ্টি'র মতো কাজ করার ইচ্ছা ব্যক্ত সম্পাদকীয়টিতে। তদুপরি বলতে হয়, যথেষ্ট মুক্ত মনের পরিচয় বিধৃত রয়েছে এই বক্তব্যে। তা না হলে এই ভাষণ কখনো উচ্চারিত হতো না যে, এক সময় মুসলিমরা বাংলা ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখতো এবং বাড়ির ভেতরের কথাবার্তায় এর স্থান ছিলো না। 'মোস্‌লেম ভারতে'র এক বছর পূর্তি সংখ্যায় আবার একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ এক বছর ধরে বারোটি সংখ্যা প্রকাশের পর

পরিচালকদের অভিজ্ঞতার সামান্য উল্লেখ আছে এখানে। সম্পাদকীয়তে স্বীকার করা হয়েছে যে, পত্রিকার কোন সংখ্যাই ঠিক সময়ে প্রকাশ করা যায়নি, পরিচালকদের অর্থদণ্ড ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, প্রবন্ধ, গান, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত স্বরলিপির সঙ্গে সত্যেন্দ্রাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কায়কোবাদ, কাজী ইমদাদুল হক, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, চণ্ডীচরণ মিত্র, শেখ ফজলুল করিম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আবদুল ওদুদ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখের রচনায় সমৃদ্ধ থাকতো পত্রিকাটি। কাজী নজরুল ইসলাম তো হয়ে উঠেছিলেন 'মোস্‌লেম ভারতে'র 'লগো'র মতোই অপরিহার্য। তাঁর লেখা ছাড়া পত্রিকার কোন সংখ্যাই যেন কল্পনা করা যায় না। সম্পাদক কবি মোজাম্মেল হকের লেখা অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে এতে। জনপ্রিয়তা কিংবা সাহিত্যিক-সামাজিক বিচারে উৎকর্ষের দাবি নিয়ে কালোত্তীর্ণ বহু লেখা এ পত্রিকাতে প্রথম প্রকাশিত হয় ; নজরুল ইসলামের রচনাকে বাদ দিয়েই এ মন্তব্য করা যায়। মুজফ্‌ফর আহমদ বা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের একান্তই রাজনৈতিক কিছু প্রবন্ধের পাশাপাশি 'নন-কো-অপারেশন বা অসহযোগিতা' (রচয়িতা – আবদুল্লাহ্ আল আজাদ) ইত্যাদির মতো প্রবন্ধের ধারাবাহিক প্রকাশ প্রমাণ করে পত্রিকার সম্পাদকীয় রীতি তৎকালীন ভারতবাসীর স্বাধীনতার আন্দোলন সংগ্রামের বিপক্ষে ছিলো না। পরিচালকদের একান্ত আগ্রহ না থাকলে অন্য পত্রিকা থেকে সংকলন করে চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ সম্পর্কিত বক্তব্য বা মওলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দু থেকে অনূদিত 'খেলাফত তত্ত্ব' প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত বা মহাত্মা গান্ধীর ফটো মুদ্রিত হতো না।

'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অনেকেই 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মোজাম্মেল হক' গ্রন্থে লিখেছেন :

> বস্তুতঃ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মাসিক 'প্রবাসী'র সমৃদ্ধির মূলে রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকা ছিল, মোস্‌লেম ভারতে'র পক্ষে সে ভূমিকা ছিল নজরুলের। নজরুল ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পত্রিকার প্রাণ-প্রদীপ।[৪]

---

৪. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *মোজাম্মেল হক*, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, পৃ.

অথচ পরবর্তী সময় এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক একই রকম থাকেনি। প্রকাশক আফজালুল হক মাত্র একশ টাকায় নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্যথার দানে'র গ্রন্থস্বত্ব কিনে নেন। নজরুলের আর্থিক অস্বচ্ছলতার সুযোগে এ বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছিলো।[৫]

বাঙ্গলার কথা

'বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র' হিসেবে 'বাঙ্গলার কথা' আত্মপ্রকাশ করে। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সংখ্যা দিয়ে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২১ মোতাবেক ১৩২৮ সনের ১৪ আশ্বিন। কলিকাতার ৭নং ভবানী দত্ত লেন (হ্যারিসন রোড–কলেজ স্ট্রিটের মোড়ের কাছে) কার্যালয় থেকে 'বাঙ্গলার কথা' প্রথম প্রকাশ পায়।

'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন হেমন্তকুমার সরকার। তাঁরা উভয়েই ছিলেন সক্রিয় গান্ধীবাদী রাজনৈতিক নেতা। হেমন্তকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। পরে নদীয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বরাজ্য দলের চিপ হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তিনিই রাজনীতিতে এনেছেন। এই দুই স্বদেশী বিপ্লবীর কারণেই হয়তো এ পত্রিকাটিতে রাজনৈতিক প্রবন্ধ–নিবন্ধই স্থান পেতো– এবং তা অবশ্যই গান্ধীবাদী অহিংস–অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত। এর প্রথম সংখ্যাতে (প্রথম পৃষ্ঠায়) পত্রিকা বিষয়ক যে 'নিয়মাবলী' মুদ্রিত হয়েছে তাতে 'বাঙ্গলার কথা'র চারিত্র্য অনেকটা ধরা পড়ে। যেমন : 'জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয়ে বিজ্ঞাপন লওয়া হয়, অন্য বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।' এই 'জাতীয় উন্নতির সহায়ক' বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যাতে মুদ্রিত হয়েছে : 'জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয়ে বিজ্ঞাপন লওয়া হয়। অন্য বিজ্ঞাপন হয় না। চরকা, খদ্দর, দেশী জিনিস, পুস্তক প্রভৃতির বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।' আর লেখা সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'জাতীয় নবজাগরণের আন্দোলন বিষয়ক বিশিষ্ট প্রবন্ধ গৃহীত হইতে পারে।' প্রথম

---

৫. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : মুজফ্ফর আহমদের 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থের 'লেখার স্বত্ব বিক্রয় ও প্রথম পুস্তক প্রকাশ' অংশ।

সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে চিত্তরঞ্জন দাশের 'বাঙ্গলার কথা', 'স্বরাজ সাধনা' ও 'বস্ত্র-যজ্ঞ' নামক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি ; শেষে কিছু বিজ্ঞাপন। 'বাঙ্গলার কথা'য় সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ লিখেছেন :

> বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রীস্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। ....অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি ; তাহার যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। একবার এস, আমরা সকলে সমন্বয়ে বলি—'চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই।' একবার এস, আমরা হিন্দু মুসলমান খৃস্টিয়ান সমস্বরে বলি— 'চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের তাহা চাই।' .... এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই।' এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই!' ঐ যে মা ডাকিতেছেন! এস এস সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা, বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম্।

পত্রিকার 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তাতে জাত-পাত-ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণীর বাঙালিকে সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ধারণ করে সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার কথা বলেছেন। কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস : "সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই' জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে!"

স্বদেশী আন্দোলন সঙ্গত চেতনা-ভিত্তিক রচনা হিসেবে এই পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে (২১ অক্টোবর ১৯২১ সংখ্যায়) প্রফুল্ল ঘোষের 'ঢাকা জেলায় চরকা শিল্প' প্রবন্ধটি। ভারতের তৎকালীন জাতীয় নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর একাধিক প্রবন্ধ, বক্তৃতা ; মওলানা আবুল কালাম আজাদের 'খেলাফত তত্ত্ব' প্রবন্ধের ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাটিতে শুধু রাজনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধই প্রকাশ পেতো—অন্তত চিত্তরঞ্জন দাশ যতদিন প্রত্যক্ষ সম্পাদনা করেছেন ততদিন

কোন কবিতা প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বাসন্তী দেবীর সম্পাদনার ভারপ্রাপ্তির পর থেকে কমপক্ষে একটি কবিতা দিয়ে পত্রিকা-সূচনা প্রায় রীতিই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ভারতের জনজাগরণ ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করে আন্দোলনকে বেগবান করার নানা কারণ ও যুক্তিসমৃদ্ধ রচনাসমূহের পাশে এই আন্দোলন-সম্পূরক বিভিন্ন বিজ্ঞাপনও প্রকাশ হতো। 'স্বরাজ-সাধনা', 'বস্ত্র-যজ্ঞ', 'শিক্ষার বিরোধ', 'গোলামখানার শিক্ষা', 'স্বরাজ চাওয়া', 'ঢাকা জেলায় চরকাশিল্প', 'এক বৎসরে স্বরাজ', 'খেলাফত তত্ত্ব', 'সত্যাগ্রহ বা শান্তভাবে আইনলঙ্ঘন' ইত্যাদি শিরোনামে রচনা প্রকাশিত হয় পত্রিকায়—যার শিরোনাম দেখেই বুঝা যায় যে, এর চরিত্র কতটুকু বিপ্লবী ছিলো। 'বাঙ্গালার কথা'র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করতে গিয়ে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় যে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তৎকালীন বৃটেনের যুবরাজ ভারত সফরে আসার সংবাদে পত্রিকাটি 'যুবরাজের সম্মান' শীর্ষক এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে বৃটিশ শাসকদের তীব্র সমালোচনা করে এবং যুবরাজের অনুষ্ঠান বয়কট করার আহ্বান জানায়। ১৮ নভেম্বর ১৯২১—একই সংখ্যার পত্রিকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক 'শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল' ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক খেলাফৎ সমিতির সম্পাদক 'শ্রীমুজিবুর রহমানের যৌথ ইশতেহার প্রকাশিত হয় 'যুবরাজের ভারতে আগমন, ভারতবাসীর কর্তব্য' শীর্ষনামে। এতে যুবরাজ যেদিন বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে অবতরণ করবেন সেদিন ভারতের সর্বত্র এবং ২৪ ডিসেম্বর ১৯২১-যেদিন তিনি কলিকাতা আগমন করবেন সেদিন বঙ্গদেশে হরতাল পালনের ঘোষণাসহ তার সম্মানে আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠান বয়কট করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'বাঙ্গলার কথা'র ধারাবাহিক মাত্র এগারোটি সংখ্যা (১৬ ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সম্পাদনা করতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে অর্থাৎ প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা থেকে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। অবশ্য একাদশ সংখ্যা যখন প্রকাশ পায় তখন তিনি ও হেমন্তকুমার সরকার জেলে, তাঁদের নাম তথাপি সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক উভয়েই যেহেতু জেলে, বোধকরি সে কারণেই প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যা 'স্বরাজ তীর্থের যাত্রী' সংখ্যা হিসেবে বের হয়। হেমন্তকুমার সরকার পত্রিকাটির একাধারে সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন, আর 'কর্ম্মকর্ত্তা' হিসেবে মুদ্রিত হতো অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম। চিত্তরঞ্জন দাশ 'বাঙ্গলার কথা'র যে এগারোটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন এর মাত্র একটি সংখ্যায় (নবম সংখ্যা, ২ ডিসেম্বর ১৯২১)

কাজী নজরুল ইসলামের 'নবযুগ' নামধেয় একটি নিবন্ধ প্রকাশ পায়। এরপর বাসন্তী দেবী সম্পাদক ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক হওয়ার পর নজরুলের অন্য লেখাগুলো 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপা হয়েছে। সম্পাদক পরিবর্তন হলেও সম্পাদকীয় নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি বরং এরপর থেকে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্তরঞ্জন দাশের বিপ্লবী বিবৃতি উদ্ধৃত থাকতো। মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য-বিবৃতি ছাপা হয়েছে পূর্ববৎ। চিত্তরঞ্জন সহোদর সুকুমাররঞ্জন দাশসহ অনেক স্বদেশী রাজনৈতিক নেতার লেখা প্রকাশ পেয়েছে এই ক্ষুদ্রাকার পত্রিকায়।

কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু ও কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে নজরুলের বিশেষ কয়েকটি কবিতার কতিপয় পাঠান্তর বিষয়ে প্রথম উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে আবদুল কাদির কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী সম্পাদনার সময় এই পাঠভেদের ব্যাপারে অধিকতর তথ্য প্রদানের চেষ্টা করেছেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'নজরুল ইসলাম ও মোস্‌লেম ভারত' নামে অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের কবিতার পাঠভেদ নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। বর্তমান রচনায় 'মোস্‌লেম ভারত' এবং সেই সঙ্গে 'নারায়ণ' ও 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলোর পরবর্তী পাঠভেদ নিয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অগ্নি-বীণা

শাত্-ইল্-আরব

'মোস্‌লেম ভারত' মাসিক সাহিত্য সাময়িকীর দ্বিতীয় সংখ্যার (১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা, জ্যেষ্ঠ ১৩২৭) প্রথম লেখাটি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'সাত্-ইল্-আরব'। সাহিত্য সাময়িকীটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রথম সংখ্যা থেকে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ধরা হতো বিধায় আঙ্কিক হিসেবে কবিতাটি ১১৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। দুই পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ এ কবিতার সম্পূরক একটি রঙ্গিন ছবি ছাপা হয়েছে সাময়িকীটির দ্বিতীয় প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায়। শিল্পীর নাম পরিচয় কোথাও নেই ; তবে ছবির নীচে মুদ্রিত হয়েছে কবিতার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি। একই সংখ্যার ১৩৯ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'চিত্র পরিচয়'

দিয়েছেন 'একজন সৈনিক'। অনুমান করি, নজরুল ইসলাম স্বয়ং এই সৈনিক। কেননা, এসময় তিনি নামের আগে 'হাবিলদার' ব্যবহার করতেন এবং সে সূত্রেই 'সৈনিক কবি' হিসেবে পরিচিতি ও খ্যাতি পেয়েছিলেন। 'চিত্র পরিচয়ে' উল্লিখিত হয়েছে :

> টাইগ্রীস (দিজ্‌লা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত) বস্‌রার অদূরে একজোট হয়ে 'সাতিল-আরব' নাম নিয়েছে। তার পর, বস্‌রার পাশ দিয়ে ব'য়ে পারস্য-উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু'তিন মাইল করে' চওড়া খর্জুর-কুঞ্জ ; তাতে ছোট্ট নহর আর তারই কূলে কূলে আঙুরলতার বিতান, বেদনা নাশ্‌পাতির কেয়ারী। এখানে এলেই অনেক পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপ্‌নিই গাইতে ইস্থা করে,—
>
> 'সাতিল্‌-আরব ! সাতিল্‌ আরব ! ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
> শহীদের লোহ্‌ দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।'

'মোস্‌লেম ভারতে' প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের 'সাত্‌-ইল্‌-আরব' কবিতার ভূমিকা হিসেবেও এই 'চিত্র পরিচয়'টি সমান আদৃত হতে পারে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা'য় (১৯২২) কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ আমরা খুঁজে পাইনি ; তবে পঞ্চম সংস্করণের (চৈত্র ১৩৩৮) মুদ্রিত গ্রন্থ দেখেছি। কলিকাতার ৪২ বিধান সরণীস্থ ডি. এম. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থের লক্ষ করা যাচ্ছে, কবিতার শিরোনামের বানান-পার্থক্য। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' কার্তিক ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি 'সমালোচনার' তথ্য উল্লেখ করে লিখেছেন : "কবিতার নাম ১ম সংস্করণেও 'সাত-ইল-আরব' ছিল, কিন্তু পরবর্তী কোন এক সংস্করণে এর নামকরণ হয় 'শাত্‌-ইল-আরব'।"[৬] কিন্তু এখানেও দেখা যাচ্ছে শিরোনামের বানান সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়নি। কারণ, 'মোস্‌লেম ভারতে' ছিলো 'সাত্‌-ইল্‌ আরব', প্রাপ্ত পঞ্চম সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে 'শাত্‌-ইল্‌ আরব' আর রচনাবলীর বানান 'শাত্‌-ইল্‌-আরব'। 'মোস্‌লেম ভারতে' কবিতাটির কোন পাদটীকা বা শব্দার্থ প্রদত্ত হয়নি, গ্রন্থে এর সংযোজন লক্ষ করা

---

৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'কাজী নজরুল ইসলাম ও মোস্‌লেম', *পাণ্ডুলিপি*, নজরুল সংখ্যা, ১৩৯৮, বাংলা সাহিত্য সমিতি (বাংলা বিভাগ), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

যায়, রচনাবলীতে তারই অনুসরণ আছে। একই প্রবন্ধে মোহাম্মদ কাইউম বলেছেন : "এ নাম পরিবর্তনে নজরুলের হাত ছিল কি না, তা আমাদের জানার উপায় নেই।" কিন্তু 'মোসলেম ভারতে'র পাঠ ও গ্রন্থের পাঠ পাশাপাশি রেখে লক্ষ করার পর আমাদের মনে হয়েছে, এ পরিবর্তন সম্ভবত নজরুলের জ্ঞাতসারেই ঘটেছিলো। কেননা, গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, তিনটি আরবি-ফার্সি শব্দে 'শ' ব্যবহার করা হয়েছে—যা পত্রিকায় ছিলো 'স' বা 'ষ'। যেমন : সাতিল্ > শাতিল্, আঁসু > আঁশু, দুষ্মন্ > দুশ্মন। রচনাবলীতে অবশ্য 'আঁসু' পাঠটি অপরিবর্তিত রয়েছে। মনে হয়, আরবি-ফার্সি শব্দের উচ্চারণগত দিক লক্ষ করেই 'স' বা 'ষ' কে 'শ' করা হয়েছিলো এবং তা নজরুল কর্তৃক অনুমোদিত। একই অবস্থায় শব্দের চলিত উচ্চারণ গ্রন্থভুক্তির সময় বর্জিত হয়েছে বলেই পত্রিকায় 'লুটেচে', 'এনেচে', 'দিয়েচি' ইত্যাদি বানানে গ্রন্থে চ > ছ হয়েছে। পত্রিকার সঙ্গে গ্রন্থ ও রচনাবলীর কয়েকটি বানান পার্থক্য এরকম :

পত্রিকা	**গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ**	**রচনাবলী**
সাতিল্ আরব	শাতিল্-আরব	শাতিল্-আরব
লুটেচে	লুটেছে	লুটেছে
আঁসু-আঁখে	আঁশু-আঁখে	আঁসু-আঁখে
দেখেচি	দেখেছি	দেখেছি
দিজ্‌লা	দজ্‌লা	দজ্‌লা
উগারি'	'উগরি'	উগারি'
ত্রস্ত নীর	ত্রস্তা-নীর	ত্রস্তা-নীর
দিয়েচি	দিয়েছি	দিয়েছি
দুষমন্	দুশ্‌মন	দুশমন
পীয়ে	পিয়ে	পিয়ে
টীকা	টীকা	টিকা

উপরি-উক্ত শব্দগুলোতেই বানান-পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, কবিতার প্রথম পঙ্ক্তি অর্থাৎ 'সাতিল্-আরব ! সাতিল্-আরব ! ! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।' সাময়িকীতে কবিতার শেষ পঙ্ক্তি হিসেবে

পুনর্মুদ্রিত হয়েছিলো। গ্রন্থভুক্তির সময় তা বোধকরি বর্জিত হয় বলেই প্রাপ্ত পঞ্চম সংস্করণ ও রচনাবলীর পাঠে নেই। 'মোস্‌লেম ভারতে' কবিতাটি 'এক', 'দুই' ইত্যাদি করে ছয়টি পর্বে বিভক্ত ছিলো ; গ্রন্থে তা বর্জিত হয়েছে।

খেয়া-পারের তরণী

কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'মোস্‌লেম ভারতে'র ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৭) প্রথম লেখা হিসেবে, কিন্তু পৃষ্ঠার বিচারে ২১৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। একই সংখ্যার দ্বিতীয় প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় ঢাকার প্রয়াত খান বাহাদুর নওয়াব আহ্‌সান উল্লাহ্‌র বোন মেহেরবানু খানমের আঁকা একটি রঙ্গিন চিত্র। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> তখন নজরুল ইসলাম আর আমি ৮/এ, টার্নার স্ট্রীটে বাস করছি। কি কারণে জানি না, আফ্‌জালুল হক সাহেব ঢাকায় গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'মোস্‌লেম ভারতে' ছাপানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার বেগম মুহম্মদ আজম সাহেবার (খান বাহাদুর মুহম্মদ আজমের স্ত্রীর) আঁকা একখানা নৌকার ছবি সঙ্গে নিয়ে আসেন। পত্রিকায় ছাপানোর আগে ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তার জন্যে ছবিখানা একদিন বিকাল বেলা নজরুল ইসলামের নিকটে আফ্‌জালুল হক সাহেব রেখে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে নজরুল ইসলাম গদ্যে এই আধ্যাত্মিক ছবিখানার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে দিবেন। কিন্তু নজরুল তা করল না। সে রাত্রিবেলা প্রথমে মনোযোগ সহকারে ছবিখানা অধ্যয়ন করল এবং তারপরে, লিখল এই ছবির বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'খেয়া-পারের তরণী।"[৭]

উল্লেখ্য, মেহেরবানু চিত্রটির চেয়ে নজরুলের কবিতাই সাধারণ্যে অধিক পরিচিত। আজ একথা বলতেই হবে যে, কাজী নজরুলের 'খেয়া-পারের তরণী' একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা, কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, অন্তত ওই সময় পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছবি ও কবিতাটি ছাপা হয়েছিলো একটি অন্যটির পরিপূরক হিসেবে। চিত্রটির নিচে মুদ্রিত হয়েছে কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি দুটো।

---

৭. মুজফ্‌ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা,* ১৯৯৫, মুক্তধারা, ঢাকা ; পৃ. ৫৩-৫৪

যতি-চিহ্নের ব্যাপক পরিবর্তন এবং শব্দ ও শব্দের কয়েকটি বানানের অসাম্য ছাড়া পত্রিকা, গ্রন্থ (৫ম সংস্করণ) ও রচনাবলীর মধ্যে তেমন পাঠভেদ নেই। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে পত্রিকার 'পরিত্রাণ' শব্দটি গ্রন্থে হয়েছে 'শাফায়ত', রচনাবলীতে 'শাফায়াত' এবং কবিতার নিচে শব্দটির অর্থ 'পরিত্রাণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাময়িকীর দ্বাদশ পঙ্‌ক্তির দাঁড়ি চিহ্ন গ্রন্থে ও রচনাবলীতে হয়েছে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন, ষোড়শ পঙ্‌ক্তির প্রশ্নবোধক চিহ্নটিও পরিবর্তিত হয়েছে আশ্চর্যবোধকে। যতি-চিহ্নের অন্য পরিবর্তনগুলোও উল্লেখযোগ্য। কবিতার শব্দের পাঠভেদগুলো এরকম :

পত্রিকা	**গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ**	**রচনাবলী**
পাপ-সিন্ধুতে	পাপ-সিন্ধুতে	পাপ-সিন্ধু
'কেয়ামত্'	'কিয়ামত'	'কিয়ামত'
উমর্ আলী-হাইদর	উমর্-আলী হায়দার	উমর আলী হায়দর
দাঁড়ি-মুখে	দাঁড়ী-মুখে	দাড়ি-মুখে

পত্রিকায় সম্ভবত মুদ্রণ-প্রমাদজনিত 'মঙ্গল-দাত্' (মঙ্গল-দাত্রী) ছাপা হয়েছে। তবে 'আহ্‌মদ' ও 'লা শরীক আল্লাহ!' শব্দ ও বাক্যাংশ দুটো মোটা ও বড় অক্ষরে 'মোস্‌লেম ভারতে' মুদ্রিত হয়েছিলো। পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার পাদটীকায় 'লা' ও 'শরীক' শব্দ দুটোর অর্থ যথাক্রমে 'নাই' ও 'অংশী' দেয়া আছে। কিন্তু গ্রন্থে 'লা শরীক আল্লাহ্' বাক্যাংশের অর্থ 'ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নাই' ছাড়া আরও চারটি আরবি-ফার্সি শব্দের অর্থ প্রদত্ত হয়েছে। অবশ্য রচনাবলীতে 'কিয়ামত' শব্দটি বর্জিত হয়েছে দেখা যায়। সেখানে বাক্যাংশটির অর্থ ছাড়া আর তিনটি শব্দের অর্থ আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতাটি পড়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লিখেন যা 'মোস্‌লেম ভারতে'র ১৩২৭-ভাদ্র সংখ্যায় 'একখানি পত্র' শীর্ষনামে মুদ্রিত হয়। ওই চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন :

> পরিশেষে একটি বিনীত নিবেদন আছে। যে সকল ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আচার প্রথার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেগুলি না থাকিলে মুসলমান জীবনের বাস্তব চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না, এবং অনেক স্থলে যে শব্দগুলিই ভাষার একটি ভঙ্গীরূপে পরিগণিত হইবে—

সেইগুলিকে আমাদের মত নিরক্ষর হিন্দু পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য (অন্ততঃ প্রথম কিছুদিন) কি উপায় করিতে পারেন?'[৮]

মোহিতলাল মজুমদারের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ করি গ্রন্থভুক্ত করার সময় নজরুল ইসলাম এই কবিতার অপরিচিত অরবি-ফার্সি শব্দের অর্থ পাদটীকায় প্রদান করেন। নজরুল ইসলাম মোহিতলালের এই চিঠির উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য যে গভীর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই চিঠির অব্যবহিত পরে রচিত কবিতাগুলোর আরবি-ফার্সি শব্দার্থ প্রদানের দীর্ঘ তালিকা দেখলেই।

কোরবাণী

'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্তর 'কোরবাণী' কবিতাটি 'মোস্‌লেম ভারত' সাহিত্য সাময়িকীর ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যার (ভাদ্র ১৩২৭) প্রথম মুদ্রিত লেখা হিসেবে প্রকাশ পায়। পৃষ্ঠা সংখ্যার বিচারে ২৮৯ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে এর ছাপা শুরু। বেশ দীর্ঘ কবিতা 'কোরবাণী'। পত্রিকা, গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ ও রচনাবলীর পাঠে বেশ পাঠভেদ লক্ষ করা যায়।

'মোস্‌লেম ভারতে' ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে শনাক্ত করে নয়টি পৃথক স্তবকে বিভক্ত ছিলো কবিতা। গ্রন্থ বা রচনাবলীতে স্তবক বিভক্তির ব্যাপার নেই, তাই ক্রমিক সংখ্যাগুলোও অবলুপ্ত। কবিতার শেষে প্রথম পঙ্‌ক্তির পুনরুল্লেখ ছিলো না পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে। গ্রন্থ এবং রচনাবলীতে উভয় স্থানেই দেখা যাচ্ছে, প্রথম পঙ্‌ক্তির পুনরুল্লেখ করেই কবিতাটি সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠভেদ রয়েছে পত্রিকা, গ্রন্থ এবং রচনাবলীতে। যেমন :

ক) পত্রিকার পাঠ –

'ওরে হত্যা নয়, আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদ্‌-বো-ধন!'

খ) গ্রন্থের পাঠ (৫ম সংস্করণ)

'ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্‌-বোধন!'

---

৮. মোজাম্মেল হক্‌ (সম্পাদিত), *মোস্‌লেম ভারত, ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা*; ভাদ্র ১৩২৭

গ) রচনাবলীর পাঠ –

'ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন !'

দেখা যাচ্ছে, পত্রিকায় 'নয়'-এর পর একটি কমা (,) ছিলো, গ্রন্থ ও রচনাবলীতে তা নেই। গ্রন্থ ও রচনাবলীর 'সত্য-গ্রহ'-এর পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বরূপ 'সত্যাগ্রহ'। তাছাড়া পঙ্‌ক্তির সর্বশেষ শব্দটি 'উদ্-বোধন' ; 'উদ্-বোধন' ; 'উদ্বোধন' হিসেবে যথাক্রমে পত্রিকা, গ্রন্থ ও রচনাবলীতে মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়াও আরও কিছু বানান-ভেদ লক্ষ করা যায় :

পত্রিকা	**গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ**	**রচনাবলী**
কুরবাণীর	কোর্‌বাণীর	কোরবাণীর
বাস্ ?	ব্যাস্ ?	ব্যস্ ?
লুপ্ত	সুপ্ত	সুপ্ত
কাঁদে, শক্তি-দুঃস্থ	কাঁদে-শক্তি-দুস্থ	কাঁদে—শক্তি-সুস্থ
এ-ত্যাগে	এতে	এতে
এদিনে	তাই	তাই
বলীর	বলির	বলির
তবু শঙ্কা রে !	করে শঙ্কা কে ?	করে শঙ্কা কে ?
আজ্	আর	আর

কবিতার ২২ ও ৭০ সংখ্যক পঙ্‌ক্তির দুটোতে পত্রিকায় মুদ্রিত 'আজ্' গ্রন্থ ও রচনাবলীর পাঠে পরিত্যক্ত হয়েছে। এর চেয়েও আর একটি উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ হলো : পত্রিকায় প্রকাশিত ৬৮ সংখ্যক পঙ্‌ক্তি 'দিন বিসর্জ্জনের আজ্ না ওই্ ?' পাঠান্তরিত হয়ে গ্রন্থ ও রচনাবলীতে হয়েছে 'কোরবাণী-দিন আজ না ওই্ ?'

মোস্‌লেম ভারতে'র এর পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত 'খেয়া পারের তরণী' কবিতার 'লা' এবং 'শরীক' এই দুটো শব্দ তারকা চিহ্নিত করে এর বাংলা অর্থ প্রদান করা ছিলো। 'কোরবাণী' কবিতায় আরবি-ফার্সি শব্দের আধিক্যের কারণেই কোন তারকাচিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি। তবে পত্রিকায় প্রদত্ত 'জালিম', 'জোরবান', জোরজান', 'গোর্দ্দা' ও 'কিয়ামত' শব্দের অর্থ প্রদান গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থে

'গর্দান' শব্দের অর্থ প্রদান এবং 'ইবরাহিম' ও 'হাজেরা'র পরিচয় দেয়া আছে। রচনাবলীর পাঠও গ্রন্থের পাঠের অনুরূপ।

মোহর্‌রম

'মোস্‌লেম ভারত' সাহিত্য সাময়িকীর ৩৬১ সংখ্যক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় 'মোহর্‌রম' কবিতাটি ; পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যার (আশ্বিন ১৩২৭) প্রথম কবিতা। সুদীর্ঘ এই কবিতা 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষে অন্তর্ভুক্ত। পত্রিকা, গ্রন্থ এবং রচনাবলীর পাঠে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তবে পত্রিকায় প্রকাশিত সর্বশেষ পঙ্‌ক্তি দুটো :

দুনিয়াতে দুর্ম্মদ খুনিয়ারা ইস্‌লাম !
লোহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম ! !

পরবর্তীকালে সম্ভবত কবি নিজেই পরিত্যাগ করেছিলেন বলে গ্রন্থ বা রচনাবলীর কোন পাঠেই তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে পঙ্‌ক্তি দুটো সম্পূর্ণ কবিতার ভাবাদর্শকেই ম্লান করে এবং রক্তের বদলে রক্ত নেয়ার আহবান জানানোর দায় আবশ্যিকভাবেই এসে পড়ে কবির উপর। পঙ্‌ক্তি দুটোর বর্জন কবিতাটিকে মহত্ত্বের দিকেই অগ্রসর করেছে বলে মনে করি।

কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'লা'ল' শব্দের অর্থ পুত্র। পত্রিকায় বানান ছাপা হয়েছিলো 'লাল' ; গ্রন্থে 'লা'ল' করায় পঙ্‌ক্তিটির অর্থ স্পষ্টতর হয়েছে। যেমন :

নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
'আম্মা লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া'।

অবশ্য গ্রন্থে 'লা'ল' শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে 'জাদু', পত্রিকায় কোন অর্থ দেয়া হয় নি। কতিপয় বানানের পরিবর্তন ঘটেছে :

পত্রিকার 'মা' থনে দুধ নাই—' গ্রন্থ ও রচনাবলীতে হয়েছে 'মা'র স্তনে দুধ নাই—'। এছাড়াও দখিণা › দখিনা, সখিণা › সকীনা, দুষ্‌মন › দুশ্‌মন, যাদু › জাদু, আসবার › আস্‌ওয়ার, ঝাঁজরা › ঝাঁঝরা, দুফরে › দুপুরে, উষ্ণীশ › উষ্ণীষ ইত্যাদি আরও কিছু বানান পরিবর্তন বা সংশোধন লক্ষ করা যায়। 'মোস্‌লেম ভারতে' মাত্র বারোটি আরবি-ফার্সি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছিলো। গ্রন্থ ও রচনাবলীতে

এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ঊনত্রিশে। পত্রিকায় চার পঙ্‌ক্তি নিয়ে গঠিত একুশটি পূর্ণ স্তবক ও একটি অর্ধ স্তবকে কবিতাটি বিন্যস্ত থাকলেও গ্রন্থে তা রক্ষিত হয়নি।

বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলামের নামের আগে 'বিদ্রোহী কবি' এই বিশেষণটি সংযুক্তির ক্ষেত্রে 'বিদ্রোহী' কবিতাটির শিরোনামের প্রভাব অনিবার্য। ইত:পূর্বে 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' নামে তিনি লিখেছেন ; 'বিদ্রোহী'র শিরোনামের নিচের ওই লেখক-নাম মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পর 'মোস্‌লেম ভারতে' নজরুল ইসলাম আর 'হাবিলদার' শব্দটি ব্যবহার করেননি। অথচ, ইতোপূর্বে তিনি 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' লেখক নাম ব্যবহার করতেন। 'নজরুল ইসলাম' নামে ওই সময় অন্য কোন লেখক না থাকলেও 'হাবিলদার'-এর প্রতি নিশ্চয়ই কোন দুর্বলতা বা আকর্ষণে নজরুল তা স্বীয় নামের আগে ব্যবহার করে থাকবেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর এর ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তায় সম্ভবত কবি 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' বলেই জনমুখে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই ধরনের আরও কবিতা রচনা ও ইংরেজ প্রশাসনের রোষানলে পতিত হওয়ার কারণে বোধকরি তিনি 'বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম' হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা পান। তদুপরি একথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, এর পেছনে 'বিদ্রোহী' কবিতার একটি প্রচ্ছন্ন হলেও প্রভাব ছিলো।

'বিদ্রোহী' 'মোস্‌লেম ভারতে'র ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড (কার্তিক, ১৩২৮) ৩য় সংখ্যার ১৯৪ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে ১৯৯ প্রায় দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী ছাপা হয়। এর মধ্যে নজরুল ইসলামের হাবিলদার পোশাক পরিহিত সোয়া ১৫ × সাড়ে ১০ সেন্টিমিটার মাপের একটি পূর্ণ-পৃষ্ঠার ফটোগ্রাফ মুদ্রিত হয়ে উল্লেখ আছে 'বিদ্রোহী'র তিনটি পঙ্‌ক্তি :

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা'
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
আমি উন্মাদ আমি ঝঞ্ঝা !

'মোস্‌লেম ভারতে' প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও কবিতাটি সাপ্তাহিক 'বিজলী' (২২ পৌষ ১৩২৮), 'প্রবাসী' (মাঘ ১৩২৮), 'সাধনা' (বৈশাখ ১৩২৯), 'ধূমকেতু' (আগস্ট ১৯২২) ইত্যাদি পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আগে

জনসমক্ষে এসেছিলো এ নিয়ে বিতর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে নজরুল ইসলামের কক্ষ-সহচর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> অনেকে যে লিখেছেন 'বিদ্রোহী' 'মোস্‌লেম ভারতে' প্রথম ছাপা হয়েছিল সেটা ভুল। আফ্‌জাল সাহেব [মোস্‌লেম ভারতের প্রকাশক] কার্তিকের 'মোস্‌লেম ভারতে'র জন্য যখন কপি নিয়ে গিয়েছিলেন তখন পৌষ মাস ছিল। আমার ধারণা, তাঁর কার্তিক সংখ্যা ফাল্গুন মাসের আগে বার হয়নি। মোস্‌লেম ভারত' নিয়মিত বার হত কিনা সেটা আজ যাঁরা নজরুল সম্বন্ধে লিখছেন তাঁরা কি করে বুঝবেন? ....আসলে কিন্তু পৌষ মাসের (ডিসেম্বর, ১৯২১ মাসের শেষ সপ্তাহের) আগে নজরুল ইসলাম তার 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনাই করেনি কাজেই 'বিদ্রোহী' প্রথম ছাপানোর সম্মান সাপ্তাহিক 'বিজলী'রই প্রাপ্য।[৯]

অন্যদিকে 'বিদ্রোহী' কবিতার ভাব কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'আমি' নামক একটি গদ্য রচনা থেকে গৃহীত বা ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'সঙস্ অভ মাইসেল্ফ'-এর সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য আছে- এ রকম প্রচারণাও উঠেছিলো। গোলাম মোস্তফা কবিকে আক্রমণ করে লিখেছিলেন কবিতা 'নিয়ন্ত্রিত', সজনীকান্ত দাস 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে রচনা করেছিলেন 'ব্যাঙ' নামের প্যারোডি কবিতা। সমকালীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অতিক্রম করে 'বিদ্রোহী' আজ বাংলা সাহিত্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবিত হিসেবে আদৃত।

'বিদ্রোহী' 'অগ্নি-বীণা'র দ্বিতীয় কবিতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটির দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠও পাওয়া যাচ্ছে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রণের বদৌলতে। 'বিদ্রোহী' কবিতার যে চারটি পাঠ আমাদের সম্মুখে আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় কোন স্তবক বিন্যাস ছিলো না। দ্বিতীয় সংস্করণে পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত হয়েছে কবিতাটি। 'আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি' থেকে দ্বিতীয়, 'আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক' থেকে তৃতীয়, 'আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি' থেকে চতুর্থ এবং 'আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়' থেকে পঞ্চম স্তবকের সূচনা। পঞ্চম সংস্করণে আটটি স্তবক বিভাগ দেখা যায় ; অন্যদিকে রচনাবলীতে ছোট-বড় মিলিয়ে স্তবকের সংখ্যা এগারো।

কবিতাটির একটি স্তবকের পরিমার্জিত পাঠভেদ চোখে পড়ে। 'মোস্‌লেম ভারতে' ছিলো :

---

৯. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *প্রাগুক্ত*; পৃ. ১৯০-৯১

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন,
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি' হা-হা হা- হা হি-হি-হি হি,
তাজি বোর্‌রাক আর উচ্চৈ:শ্রবা বাহন আমার,
হাঁকে চিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ চিঁ-হিঁ-হিঁ হিঁ!

অগ্নি-বীণা'য় এই অংশটুকু বিশেষ পরিবর্তন করা হয়েছে এভাবে :

'আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয়-কেতন!
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্ত্য করতলে,
তাজি বোর্‌রাক আর উচ্চৈ:শ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে।

পঞ্চম সংস্করণের এই পাঠের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ সংকলিত পাঠ ও বাংলা একাডেমীর (ঢাকা) নয়া সংস্করণ রচনাবলীর পাঠের মিল রয়েছে। আবদুল কাদির তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী'তে গ্রন্থের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছেন বলে দাবি করেন।[১০] তাঁর গৃহীত পাঠের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য থাকায় একথা বলতে হয় যে, সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকে গ্রন্থভুক্ত করার সময়ই এ পাঠ-পরিবর্তন ঘটেছিলো।

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ থেকে গ্রন্থে প্রাপ্ত পাঠগুলোর মধ্যে পাঁচটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিত হয়। এই পঙ্‌ক্তিগুলো হচ্ছে :

---

১০. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদনে' সম্পাদক দাবি করেছেন : 'আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগুলির (গ্রন্থের) প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।'

'আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,
আমি বিবসন আজ ধরাতল নভ, ছেয়েছে আমারি জটাজাল!
আমি ধন্য ! আমি ধন্য!!
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর, বিদ্রোহী সৈন্য!
আমি ধন্য! আমি ধন্য!!

বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৯৬৬) 'নজরুল রচনাবলী' সম্পাদনাকালে আবদুল কাদির দাবি করেছেন, তিনি নজরুলের গ্রন্থগুলোর প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করেছেন ; এই বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে 'বিদ্রোহী'র প্রথম গ্রন্থভুক্তি–পাঠ, মুজফ্ফর আহমদ সংকলিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ, ডি. এম. লাইব্রেরি প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণের পাঠ এবং বাংলা একাডেমীর নতুন সংস্করণ রচনাবলীর পাঠে কোথাও পঙ্‌ক্তি পাঁচটি গৃহীত হয়নি। 'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!' এবং 'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার' এই পঙ্‌ক্তি দুটোর মধ্যবর্তী ছিলো উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি পাঁচটির অবস্থান ।

আর একটি পাঠভেদ সম্পর্কে উল্লেখ করা বিশেষ দরকার। কেননা, এই উল্লেখের সঙ্গে আবদুর কাদির তাঁর সম্পাদিত রচনাবলীতে 'অগ্নি–বীণা'র প্রথম সংস্করণ থেকে পাঠগ্রহণ করেছেন – এই উক্তিটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। পাঠভেদটি কবিতার সর্বশেষ পঙ্‌ক্তি নিয়ে –

১) 'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ –

'আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির–উন্নত শির!!'

২) আবদুল কাদির দাবিকৃত প্রথম সংস্রণের পাঠ—

' বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির–উন্নত শির!!'

৩) মুজফ্ফর আহমদ সংকলিত দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ –

'আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির–উন্নত শির!!'

৪) পঞ্চম সংস্করণ 'অগ্নি–বীণা'র পাঠ –

'আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির–উন্নত শির!!'

৫) নয়া সংস্করণ রচনাবলীর পাঠ –

' বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির ! !'

উপরিউক্ত পাঁচটি পাঠ লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকে গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ অবধি কবিতার সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিতে 'আমি' পদটি ছিলো। পরে তা কোন কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে। আবদুল্‌ কাদির যদি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাঁর পাঠেও 'আমি' পদটি থাকার কথা। কিন্তু তা নেই বিধায় তিনি রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্তির সময় 'অগ্নি-বীণা'র প্রথম সংস্করণ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

সাময়িকী ও গ্রন্থের পাঠের মধ্যে কয়েকটি বানান পরিবর্তন ও শুদ্ধি দেখা যায়। যেমন :

বিধাতৃর › বিধাত্রীর	রাজটীকা › রাজটিকা
তন্বি › তন্বী	অনুখণ › অনুখন
বেণু বীনে › বেণু বীণে	তিয়াষা › তিয়াসা
কাল-ফণি › কাল-ফণী	

'মোস্‌লেম ভারতে' মুদ্রিত ও কবিতার নিচে শব্দের কোন অর্থ প্রদত্ত হয়নি। আবদুল কাদির গৃহীত পাঠ ও পঞ্চম সংস্করণের পাঠের নিচে তিনটি শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা দেয়া আছে! রচনাবলীতে অবশ্য তা নেই।

কামাল পাশা

কাজী নজরুল ইসলামের 'কামাল পাশা ' 'মোস্‌লেম ভারতে'র ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যায় (কার্তিক ১৩২৮) প্রকাশ পায়। ১৭৩ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হয়ে ১৮৩ সংখ্যক পৃষ্ঠায় এর সমাপ্তি ঘটে। একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'বিদ্রোহী'। এ কারণে 'মোস্‌লেম ভারতে'র এই সংখ্যাটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। 'বিদ্রোহী'র আগেই 'কামাল পাশা ' রচিত হয়েছিলো।

'মোস্‌লেম ভারতে' প্রকাশিত কবিতার পাঠের সঙ্গে প্রাপ্ত গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ ও রচনাবলীর পাঠে কোথাও কোথাও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১) 'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ –

' হা ! হা ! হা !

হেসে নাড়ীই ছেঁড়ে বা !

হা হা হা ! হা ! হা ! '

২) পঞ্চম সংস্করণ ও রচনাবলীর পাঠ একই রকম –

হাঃ । হাঃ। হাঃ।

হেসে নাড়ীই ছেঁড়ে বা।

হা হা হাঃ ! হাঃ ! হাঃ !

কবিতার মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীতে কথা সংযোজন করে একে আরও দৃশ্যমান ও জীবন্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম কয়েকটি স্থানে পরিবর্তন এনেছেন।

'মোস্‌লেম ভারতে' ছিলো :

' [সামনে পার্ব্বত্য পথ হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম দিয়া গেল, — 'মার্ক টাইম !' সৈন্যগণ একস্থানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল,—

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !

লেফ্‌ট্ ! রাইট্ ! লেফ্‌ট্ !]'

কিন্তু গ্রন্থভুক্তির সময় এর মধ্য থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি দুটোকে মুক্ত করা হয় এবং তা দাঁড়ায় এ রকম –

'[সামনে পার্ব্বত্য পথ – হঠাৎ যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। হাবিলদার-মেজর পথ খুঁজিতে লাগিল। হুকুম দিয়া গেল —'মার্ক টাইম !' সৈন্যগণ একস্থানেই দাঁড়াইয়া পা আছড়াইতে লাগিল –]

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !

লেফ্‌ট ! রাইট ! লেফ্‌ট !

দ্রাম ! দ্রাম ! দ্রাম !'

এ রকম আরও পরিবর্তন লক্ষ করা যায় কবির কথা সংযোজনের মধ্যে। 'মোস্‌লেম ভারতে' যেখানে বন্ধনীতে কথা ছিলো না, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার সময় কবি সেখানে

এভাবে জুড়ে দিয়েছেন কথা –

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ

'আওরৎ সব যুদ্ধে আসিস্! যা যা!

খুন দেখেছিস বীরের? হাঁ দেখ্ টক্‌টকে লাল কেমন গরম তাজা!

আওরৎ সব যা যা!!'

'অগ্নি–বীণা'র পাঠ –

"মুর্দ্দারা সব যুদ্ধে আসিস! যা যা!

খুন দেখেছিস্ বীরের? হাঁ দেখ টক্‌টকে লাল কেমন গরম তাজা!

মুর্দ্দারা সব যা যা !!

[বলিয়াই কটিদেশ হইতে ছোরা খুলিয়া হাতের রক্ত লইয়া দেখাইল]"

অনুরূপভাবে সাময়িকীতে তৃতীয় বন্ধনীতে ছিলো :

[হাবিলদার–মেজর ঃ লেফ্‌ট ফর্ম্ম! লেফ্‌ট রাইট! লেফ্‌ট – ফরওয়ার্ড! — বাহিনীর মুখ হঠাৎ বামদিকে ফিরিয়া গেল। পার্শ্বেই পরিখার সারি। পরিখাভর্ত্তি নিহত সৈন্যের দল পচিতেছে।]

'অগ্নি–বীণা'তে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে : 'এবং কতকগুলি অসামরিক নগরবাসী তাহা ডিঙ্গাইয়া চলিতেছে।' একইভাবে '[সেতু পার হইয়া আবার জোরে মার্চ্চ করিতে করিতে তাহাদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল]' এর আগে যোগ করা হয়েছে 'নিহত সৈন্যদের নামাইয়া রাখিয়া দিয়া'।

আরও একটি স্তবকে পাঠ পরির্তন দেখা যায়।

'মোস্‌লেম ভারতে' আছে —

"বাঁচলো যারা রইল বেঁচে!

এই ত জানি সোজা হিসাব! দুঃখ কি তার? আঃ?

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

মরায় দেখে ডরায় এরা! ভয় কি মরায়? বা ঃ!

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !"

'অগ্নি-বীণা'য়, এই পাঠের পরিবর্তন হয়েছে এভাবে -

"বাঁচল যারা রইল বেঁচে !

এই ত জানি সোজা হিসাব ! দুঃখ কি আর আঁ ?

মরায় দেখে ডরায় এরা ! ভয় কি মরায় ? বাঃ !

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !"

এই পঙ্‌ক্তিগুলোরই অব্যবহিত পূর্বের পঙ্‌ক্তি থেকে একটি 'হাঃ' গ্রন্থভুক্তির সময় পরিত্যাজ্য হয়েছে। কিন্তু 'খবর বেরোয় দৈনিকে' পঙ্‌ক্তির পরের পঙ্‌ক্তিতে 'আর' সংযোজিত হয়েছে। পত্রিকায় তা ছিলো না। গ্রন্থে হয়েছে :

'আর একটি কথায় দুঃখ জানান, 'জোর মরেছে দশটি হাজার সৈনিকে'

'মোস্‌লেম ভারতে'র —

'অরুণ খুনের তরুণ শহীদ হতভাগা রে !

'অগ্নি-বীণা'য় করা হয়েছে —

'তরুণ খুনের তরুণ শহীদ হতভাগা রে !'

'মোস্‌লেম ভারতে'র একটি পঙ্‌ক্তিকে গ্রন্থে দুই পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত করে সন্নিবেশ করা হয়েছে। যেমন :

'মোস্‌লেম ভারতে' —

'নাচ্‌না থামা রে ! — কে ভাই ? হা হা সালাম !'

'অগ্নি-বীণা'য় —

'নাচনা থামা রে !

[আহতদের নামাইতে নামাইতে]

কে ভাই ? হাঁ। হাঁ সালাম !'

পত্রিকা থেকে গ্রন্থভুক্তির সময় বেশ কিছু বানানের শুদ্ধি বা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন :

ক্ষেপেচে > ক্ষেপেছে　　　　উঠেচে > উঠেছে

দুষ্‌মন্ › দুশ্‌মন্	হিংশুক › হিংসুক
খারাব › খারাপ	বর্ষা বেঁধা › বর্শা বেঁধা
নীল শিয়াটা › নীল সিয়াটা	পিয়ায় › প্রিয়ায়
বই লিখে › বই লেখে	দশটা › দশটি ইত্যাদি

পত্রিকায় তেত্রিশটি শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছিলো। গ্রন্থে একত্রিশটি সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষের বাঁশী

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্ দহম্

(আবির্ভাব)

'মোস্‌লেম ভারত' সামযিক পত্রিকার ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড
১৩২৭) প্রথম কবিতা হিসেবে নজরুলের 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্ দহম্' প্রকাশিত হয়। ৪৯১ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে মুদ্রিত সাড়ে চার পৃষ্ঠা ব্যাপী এই দীর্ঘ কবিতাটির প্রতি পৃষ্ঠা শেষে আরবি-ফার্সি শব্দের একটি দীর্ঘ-'কুঞ্জিকা' ছাপা হয়েছে। পরবর্তী সময় 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এতে কুঞ্জিকার দৈর্ঘ্যও খানিকটা হ্রাস পায়।

'বিষের বাঁশী'র চতুর্থ সংস্করণ (বৈশাখ, ১৩৫৫) আমরা দেখেছি। এর প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ না পেলেও বর্তমান সংস্করণ প্রথম সংস্করণের 'অবিকল প্রতিলিপি'[১১] হওয়াতে আমরা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে এর পাঠভেদ

---

১১. *বিষের বাঁশী*, ৪র্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৫, নূর লাইব্রেরী পাবলিশার, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। 'প্রকাশকের নিবেদন' :

"প্রথম সংস্করণের পুস্তকের কৈফিয়তে কবি লিখিয়াছিলেন : 'অনেক দোষ-ক্রটি রয়ে গেল।... যদি অবকাশ ও শান্তি পাই, তাহলে দ্বিতীয় সংস্করণে এর দোষ-ক্রটি নিবারণের চেষ্টা করব।' কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কবি আজ কঠিন রোগে আক্রান্ত। অবকাশ বা শান্তি কবে পাইবেন তাহা বলিতে পারি না। তিনি নিজে যে সব

বা বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করেছি। এতে দেখা গেছে, বড় ধরনের কোন পাঠ–পরিবর্তন বা পাঠভেদ এতে নেই। তবে বহু শব্দের বানান–ভেদ এখানে স্পষ্ট। পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত এই কবিতার বানান–ভেদ পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো ঃ

পর্যায় - এক

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ	গ্রন্থের পাঠ
খর্‌জুর্‌ -শীষে	খর্জ্জুর-শীষে
কুর্‌নিশে	কুর্ণিশে
মুজ্‌দা	মুঝ্‌দা
তিহারাণ	তিহারান
শামান্‌	সামান্‌

পর্যায় - দুই

মস্‌তা–ন	মস্‌ তান
ব্যস্‌ থা–ম্‌	ব্যস্‌ থাম্‌
গোল্‌শান্‌	গুলশান্‌
গোল্‌ফাম্‌	গুল্‌ফাম্‌
'তূর্‌'–শির	'তুর'–শির
ফূর্ত্তির	ফুত্তির
উষ্‌–নীশে	উষ্ণীষে
বেদূইন্‌	বেদুইন্‌
আলায় হি সাল্‌লম	আলায় হি সাল্‌লাম্‌

দোষ–ত্রুটি নিবারণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর সম্ভব হইল না। সে ধৃষ্টতা আমাদের নাই। সেই জন্য প্রথম সংস্করণের অবিকল প্রতিলিপিই প্রকাশিত হইল।"

পর্যায় - তিন

সাবেঈ–ন	সাবে ইন্
তাবেঈ–ন	তাবে ঈন্
ইব্লিশ্	ইবলিস্
আজ্হরদম্	আজ হরদম্

পর্যায় - চার

জঞ্জা–ল	জন জাল
কঙ্কা - ল	কঙ্ কাল
জান পেয়ে	জান - পেয়ে
ফেরদৌসের	ফিরদৌসের
বয়তূল্লাতে	বয়তুল্লাতে

পর্যায় - পাঁচ

শর্ওয়া–ন	শর্ ওয়ান
দর্ওয়া– ন	দর্ ওয়ান
চির সাচ্চারই	চির–সাচ্চারই
রুহু	রুহ
জোর্–শো–র	জোর–শোর
কালা–ম	কালাম
সালা–ম	সালাম

এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো : সাময়িক পত্রিকায় কবিতার পঞ্চম পর্যায়ে ছিলো 'কোর্–আন্ !' কিন্তু গ্রন্থে তা করা হয়েছে 'কোর্–আন্ ?'

ফাতেহা-ই-দোয়াজ্ দহম্

(তিরোভাব)

১৩২৭ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ২য় সংখ্যা) 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ্ দহম্' শিরোনামে কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এক বৎসর পর ১৩২৮ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেও (২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা) একই শিরোনামে কবির আর একটি কবিতা প্রকাশ পায়। প্রথম কবিতাটির উপ-শিরোনাম ছিলো 'আবির্ভাব', এটির 'তিরোভাব'। 'মোস্‌লেম ভারতে'র এ সংখ্যাটি 'রবিয়ল আউয়াল ১৩৪০' মাস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা হিসেবে বের হয়। সংখ্যাটির প্রথম লেখাই এ কবিতা ; ২০৯ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে মুদ্রিত পরে 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি স্থান পায়। এ কবিতা সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত। পত্রিকায় মুদ্রিত ও গ্রন্থের পাঠে বিশেষ কোন পাঠভেদ নেই। তবে কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ে —

মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ –

'আজ জাহান্নামের বহ্নি-বারিধি নিবে গেছে ক্ষরি 'জল'

গ্রন্থের পাঠ –

'আজ জাহান্নামের বহ্নি-সিন্ধু নিবে গেছে ক্ষরি 'জল'

এবং পত্রিকার 'ফের্‌দৌসে'র বানানটি গ্রন্থে 'ফির্‌দৌসে'র হয়েছে। তাছাড়া চতুর্থ পর্যায়ের শেষ পঙ্‌ক্তিতে —

'মোস্‌লেম ভারতে' ছিলো – 'দারাজ দস্তে'

গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে – 'দারাজ হস্তে'।

অর্থগত দিক থেকে উভয়েরই অর্থই 'বিশাল হাতে'— সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে কবিতার অর্থগত কোন পরিবর্তন আসেনি। তবে গ্রন্থে সম্ভবত মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্যেই 'দস্তে' 'হস্তে' হয়ে গেছে। কেননা, পাদটীকায়, 'দারাজ দস্তে'রই অর্থ দেয়া আছে, 'দারাজ হস্তে'র নয়। এই কবিতার ক্ষেত্রে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাদটীকা'র খানিকটা বর্জন করে গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

বোধন

'মোস্‌লেম ভারতে'র ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) প্রথম প্রকাশিত রচনাই কাজী নজরুল ইসলামের 'বোধন' কবিতা? 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে পরে তা অন্তর্ভুক্ত হয়। পত্রিকা শিরোনামের নিচে বন্ধনীতে মুদ্রিত ছিলো : সুর – 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ'। গ্রন্থভুক্তির সময় তা বর্জিত হয়েছে। কবিতার নিচে উল্লেখ ছিলো : "হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ আয়দ্‌ব-কিন্‌আন্ গম মখোর' শীর্ষক গজল্ অবলম্বনে"। গ্রন্থে কিন্তু হুবহু এই বক্তব্যটি রাখা হয়নি। সেখানে বরং একটু পরিবর্তন করে উল্লেখ করা হয়েছে : "হাফিজের 'য়ুসোফে গুম গশতা বাজ আযেদ্ ব-কিন্‌আন্ গম্ মখোর' শীর্ষক গজলের ভাবছায়া"। লক্ষ্য করার বিষয়, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি ছিলো হাফিজের গজল 'অবলম্বনে' কিন্তু গ্রন্থের কবিতাটি 'ভাবছায়া'। আর তাই কবিতায় পাঁচ বার ব্যবহৃত একটি মাত্র পঙ্‌ক্তির উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর।

'বোধন' কবিতাটি পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত ; প্রতি স্তবকেই ছয় পঙ্‌ক্তি। এর প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি –

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ –

দুঃখ কি ভাই, হারানো য়ূসোফ্ কিনানে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে !

বিষের বাঁশী'র পাঠ –

'দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ! !

এই পঙ্‌ক্তি দুটো কবিতার প্রতিটি স্তবকেরই শেষে আছে এবং সাময়িকী থেকে গ্রন্থভুক্তির সময় উপরি-উক্তভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রথম স্তবকের শেষ দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যেও দুটো পাঠভেদ চোখে পড়ে :

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ –

জীবন ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ুর-তখ্‌তে পুনঃ বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন শোভিবে এ শিরও পুষ্পতাজে !

'বিষের বাঁশী'র পাঠ –

জীবন ফাগুন যদি মালঞ্চ–ময়ূর–তখ্‌তে আবার বিরাজে,

শোভিবে ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে এ শিরও পুষ্পতাজে ! !

এছাড়া তৃতীয় স্তবকে পত্রিকার 'যারা ভাই কাবার পূত তীর্থ'–এর স্থলে গ্রন্থে হয়েছে 'যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ'। চতুর্থ স্তবকেও সামান্য কয়েকটি পাঠ–পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন পত্রিকার পাঠ : 'অস্তিত্বের এ ভিত্তি মোদের' ; কিন্তু গ্রন্থের পাঠ : 'অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের'। চতুর্থ স্তবকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'মোস্‌লেম ভারতে' ছিলো : 'নূহ্‌ আমাদের কাণ্ডারী ভাই' কিন্তু 'বিষের বাঁশী'তে হয়েছে ঃ 'সত্য মোদের কাণ্ডারী ভাই'। একই স্তবকের চতুর্থ পঙ্‌ক্তির সম্পূর্ণই পরিবর্তন ঘটেছে গ্রন্থে। 'মোসলেম ভারতে' ছিলো :

'সব পথই শেষে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেয়ে যায় মিশে অদূর পুরে।'

'বিষের বাঁশী'তে হয়েছে :

'বুকে বাঁধ্‌ বল, ধ্রুব অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।।'

কবিতাটির পঞ্চম স্তবকেও পাঠভেদ আছে। সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়েছিলো : 'কি ভয় হাফিজ,' আর গ্রন্থে তা পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে : 'কি ভয় বন্দী'।

অভয়–মন্ত্র

'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকার ১ম ভাগ ২৫শ সংখ্যার (৩১ মার্চ ১৯২২) ১৯৭ সংখ্যক পৃষ্ঠায় দুই সারিতে (Double Column) প্রকাশ পেয়েছে নজরুল ইসলামের 'অভয়–মন্ত্র' শিরোনামের কবিতা। পত্রিকায় অবশ্য শিরোনামে হাইফেন ছিলো না (অভয় মন্ত্র)। কবিতা হিসেবেই 'বাঙ্গলার কথা'য় এটি প্রকাশিত হয় কিন্তু পরবর্তীকালে 'বিষের বাঁশী' গ্রন্থভুক্তির সময় শিরোনামের নিচে বন্ধনীতে 'গান' কথাটি মুদ্রিত হয়। শুধু তাই নয়, কবিতাটির প্রথম স্তবকে 'কোরাস' শব্দটি ছেপে তা–যে সমস্বরে গাইবার প্রারম্ভিকা তা–ও শনাক্ত করা আছে গ্রন্থে। পত্রিকায় পাঁচ পঙ্‌ক্তির প্রথম স্তবক গ্রন্থে হ্রস্ব হয়ে চার পঙ্‌ক্তি হয়েছে। নিচে প্রথম স্তবকের পাঠান্তর উল্লেখ করা হলো ঃ

'বাঙ্গলার কথা'র পাঠ –

বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়!
বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়!

'বিষের বাঁশী'র পাঠ :

কোরাস্ : বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়!
মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয়!

কবিতাটির সর্বশেষ স্তবকেও পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকায় দুই পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট ছিলো ওই স্তবক, কিন্তু গ্রন্থে সেখানে আরও একটি পঙ্‌ক্তি সংযোজিত হয়েছে :

'বাঙ্গলার কথা'র পাঠ :

বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!

বিষের বাঁশী'র পাঠ :

'বল্, নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোরে সত্য বন্দী নয়!

উপরি-উক্ত পাঠভেদ ছাড়াও কবিতাটিতে আরও কিছু বানানভেদ চোখে পড়ে। এই পরিবর্তনের ফলে কবিতার অর্থ বা ভাবগত ব্যাপক কোন পরিবর্তন সাধিত না হলেও বানানভেদগুলো অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেমন –

'বাঙ্গলার কথা'র পাঠ :

১) নিজ বিধাতারে চিন্, আকাশ গলিয়া ক্ষরিবেরে বরাভয় !

তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারারুদ্ধ কি হয় ?

২) ওরে সত্য যে চির স্বয়ং প্রকাশ

৩) ঐ অত্যাচারীর সত্য-পীড়ন আছে তার আছে ক্ষয় !

৪) যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি',

৫) ঐ দুটো টুটো ফাটা লোহার শিকল

৬) তুই আত্মকে চিন্, বল্, 'আমি আছি' সত্য আমার জয় ! !

'বিষের বাঁশী'র পাঠ :

১) নিজ বিধাতারে মান্ আকাশ গলিয়া ক্ষরিবে রে, বরাভয়

তোর বিধাতার ধাতা বিধাতা, বিধাতা কারা-রুদ্ধ কি হয় ?

২) ওরে সত্য যে চির স্বয়ম্ প্রকাশ

৩) ঐ অত্যাচারীর সত্যপীড়ন ? আছে তার আছে ক্ষয় !

৪) যে গেল সে নিজের নিঃশেষ করি',

৫) ঐ টুটে-ফেটে পড়া লোহার শিকল

৬) তুই আত্মাকে চিন্, বল 'আমি আছি', 'সত্য আমার জয় !'

ভাঙার গান

ভাঙার গান

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রেফতার হয়ে জেলে যাবার পর তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী 'বাঙ্গলার কথা'র দ্বাদশ সংখ্যা থেকে সম্পাদনার ভার সরাসরি নিজে গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পাদিত সংখ্যাগুলোর একটি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো : আগে যেখানে পত্রিকাতে কোন কবিতাই ছাপা হতো না, তিনি সম্পাদক হবার পর একটি করে বিপ্লবী কবিতা ছাপা শুরু করলেন অন্যান্য লেখার সঙ্গে। কখনও কবিতাই পত্রিকার প্রথম লেখা হিসেবে ছাপছেন। তাই ধারা অনুযায়ী পত্রিকার ১ম ভাগ ১৫শ সংখ্যার (২০ জানুয়ারি ১৯২২) প্রকাশিত প্রথম লেখা ও একমাত্র কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান'। পত্রিকার পৃষ্ঠার ক্রমধারা অনুযায়ী ১১৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় দুই সারিতে মুদ্রিত হয়েছে কবিতাটি। মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে 'ভাঙার গান' শিরোনামে এতদ্সঙ্গে নানা তথ্যের উল্লেখ করেছেন। কবিতাটি রচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গিরেফ্তার হয়ে জেলে গেলেন তারপরে তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদিকা হলেন এই সময়ে তিনি একদিন দাশ পরিবারের তাঁর দেবর সম্পর্কিত শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশকে 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপানোর উদ্দেশ্যে একটি কবিতার জন্যে নজরুল ইসলামের নিকটে পাঠালেন। .... শ্রীসুকুমাররঞ্জন কবিতার জন্যে ৩/৪ সি তালতলা লেনে নজরুল আর আমার বাসায় এসেছিলেন, না এসেছিলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, তা আমি এখন ভুলে গেছি. মোটের ওপরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই কবিতা লেখা শুরু করে দিল। সুকুমাররঞ্জন আর আমি খুব আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে কবিতাটি লেখা শেষ করে নজরুল তা আমাদের পড়ে শোনাল। সুকুমাররঞ্জন খুবই খুশী হলেন। এই কবিতাটি ছিল নজরুল ইসলামের 'ভাঙার গান'।[১২]

কবির 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হিসেবে পরে তা স্থান পায়। 'বাঙ্গলার কথা'য় কিন্তু 'ভাঙ্গার গান' এই বানানে শিরোনাম ছিলো এবং তাতে স্তবক বিন্যাস ছিলো না। কিন্তু গ্রন্থে স্থান পাবার সময় শিরোনামে বানান পরিবর্তন, সংখ্যা চিহ্ন দিয়ে স্তবক বিভাজন এবং শিরোনামের নিচে বন্ধনীতে 'গান' কথাটির মুদ্রণ লক্ষ্য করা যায়। 'বাঙ্গলার কথা'র প্রথম মুদ্রণ ও পরবর্তীকালে গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতার মধ্যে উপরে উল্লিখিত শিরোনামের বানানভেদ ছাড়াও আরও কয়েকটি পাঠান্তর দেখা যাচ্ছে। নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

হাইফেন দিয়ে শব্দবন্ধ সৃষ্টি বিষয়ক পরিবর্তন এ কবিতাতেও লক্ষণীয়। যেমন :

---

১২. মুজফ্ফর আহ্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-৪০

'বাঙ্গলার কথা'য় :

১) কারার–ঐ লৌহ কবাট

২) শিকল পূজোর পাষাণ বেদী!

৩) মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে? – ইত্যাদি।

'ভাঙার গান'–এ :

১) কারার ঐ লৌহ–কবাট

২) শিকল–পূজোর পাষাণ–বেদী!

৩) মুক্ত–স্বাধীন সত্যকে রে? – ইত্যাদি।

এছাড়া প্রধান যে পাঠান্তর কবিতাটিতে দেখা যায় তা গ্রন্থভুক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে। নিচে তৃতীয় স্তবকের পত্রিকায় প্রকাশিত ও গ্রন্থের পাঠ তুলে ধরা হলো :

'বাঙ্গলার কথা'র পাঠ :

হা হা হাঁক–হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।

'ভাঙার গান'–এর পাঠ :

মার্ হাঁক–হৈদরী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!

গ্রন্থের চতুর্থ স্তবকেও এ ধরনের পাঠান্তর আছে দু' স্থানে। এখানে তার উল্লেখ করা হলো :

'বাঙ্গলার কথা'র পাঠ :

দেরে দেখি
মা'র কারাগার জোরসে নাড়ি।
লাথি মার্, ভাঙ্‌রে তালা,
মা'র ঐ বন্দী-শালায় –
    আগুন জ্বালা,
    আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি।

'ভাঙার গান'-এর পাঠ :

দেরে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার্, ভাঙ্‌রে তালা।
যতসব ঐ বন্দী-শালায় –
    আগুন জ্বালা,
    আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি।

আর একটি শব্দের পাঠভেদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, তাহলো কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির 'কবাট' ('কারার ঐ লৌহ কবাট')। 'বাঙ্গলার কথা'য় ছাপা হয়েছে 'কবাট'। ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মোতাবেক নতুন সম্করণ নজরুল রচনাবলীর (১৯৯৩) পাঠও 'কবাট'।[১৩] মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থে কবিতাটির পাঠ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। এখানেও দেখা যাচ্ছে তিনি 'কবাট' লিখেছেন।[১৪] কিন্তু আবদুল কাদির সম্পাদিত

---

১৩. বাংলা একাডেমী কর্তৃক যে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নতুন সংস্করণ নজরুল রচনাবলী, প্রথম খণ্ডে 'ভাঙার গান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ ও ক্রম অনুসৃত হয়েছে বলে পরিশিষ্টে (পৃ. ৯০০) উল্লেখ আছে।

১৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১
তিনি একই গ্রন্থের ২৬৮ ও ২৬৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলেও গ্রন্থ দুটোর প্রথম প্রকাশিত কপি পাওয়া যেতো

'নজরুল রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে ছাপা হয়েছে 'কপাট'।[১৫] সম্পাদক কাদির রচনাবলীর প্রথম সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ উল্লেখ করেছেন, "আমরা রচনাবলীতে কবির কবিতাগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণই অনুসরণ করেছি।"[১৬] উপরে উল্লিখিত 'বাঙ্গলার কথা', 'গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ উল্লিখিত কবিতার পাঠ বিবেচনা করলে আবদুল কাদির 'ভাঙার গানে'র প্রথম সংস্করণের পাঠ তাঁর সম্পাদিত রচনাবলীতে (১ম খণ্ডে) গ্রহণ করেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। কারণ গ্রন্থের পরবর্তীকালের মুদ্রণ বা সংস্করণে এই 'কবাট' পরিবর্তিত হয়ে 'কপাট' হয়ে যায়।[১৭]

ছায়ানট ও পূবের হাওয়া

কার বাঁশি বাজিল

'কার বাঁশি বাজিল' শীর্ষনামের কবিতাটি মোস্‌লেম ভারতে'র ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যার (ভাদ্র ১৩২৮) ৪২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়ে পরে 'ছায়ানট' কবিতার বইয়ে স্থান পায়। গ্রন্থে কবিতা রচনার স্থান ও তারিখ দেয়া আছে যথাক্রমে কলিকাতা, চৈত্র ১৩২৮। আমরা 'ছায়ানটে'র প্রথম সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। তবে গ্রন্থে প্রকাশ তারিখ নেই। বইটি বেরিয়েছিলো ১৯৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতার 'বর্মন পাবিলিশিং হাউস' থেকে শ্রীব্রজবিহারী বর্মন রায়ের প্রকাশনায়।[১৮]

'কাজী নজরুল ইস্‌লাম : স্মৃতিকথা' গ্রন্থটি যাঁকে তিনি উৎসর্গ করেছেন সেই আবদুল হালীম জানতেন কোন বাঁধাইওয়ালার দফতরে বইয়ের ফর্মাগুলো পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে এর প্রথম সংস্করণ না থাকার কথা নয়। এ কারণে তিনি সম্ভবত গ্রন্থটির প্রথম অথবা দ্বিতীয় প্রকাশ থেকেই তার গ্রন্থে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন বলে অনুমান করা যায়।

১৫. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২৩৭

১৬. *প্রাগুক্ত*, দ্রষ্টব্য : 'প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন'।

১৭. নজরুল ইসলাম, *ভাঙার গান*, চতুর্থ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৭১, ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা-৬

১৮. বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড) গ্রন্থেও (১৯৯৩) এই তথ্য প্রদত্ত হয়েছে, পৃ. ৯০২

প্রিন্টার ছিলেন শ্রীশশিভূষণ পাল, মেট্‌কাফ প্রেস, ১৫নং নয়নচাঁদ দত্তের স্ট্রিট, কলিকাতা। এখানে নজরুলের দশটি বইয়ের বিজ্ঞাপন ও তিনটি বাজেয়াপ্ত গ্রন্থের নাম ছাপা হয়েছে। আসলে 'ছায়ানট' প্রথম বেরিয়েছিলো আশ্বিন ১৩৩২ অনুসারে সেপ্টেম্বর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। বইয়ে মূল্য লেখা আছে পাঁচ সিকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০।

কবিতাটিতে কোন উল্লেখযোগ্য পাঠ পরিবর্তন বা পাঠভেদ লক্ষ করা যায় না। তবে নবম পঙ্‌ক্তিতে একটু বিন্যাস বৈচিত্র্য আছে সাময়িকী ও গ্রন্থে। তাছাড়া পঙ্‌ক্তিটির দাঁড়ি (।) গ্রন্থে হয়েছে আশ্চর্যবোধক (!) চিহ্ন এবং 'তনু-মন' হয়েছে 'তনু মন'।

সাময়িকীতে ছিলো :

'পুলকে এ তনু-মন ঘন ঘন নাচিল।'

গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে :

'পুলকে এ তনু মন ঘন ঘন নাচিল !'

কবিতাটি 'বাঁশি বাজিল' শিরোনামে পরে 'পূবের হাওয়া'য় অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে যতিচিহ্নের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়।

বিজয়িনী

'মোস্‌লেম ভারত' সাহিত্য সাময়িকীর শেষ সংখ্যা ১৩২৮ সনের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। এটি সাময়িকীটির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিজয়িনী' কবিতাটি মুদ্রিত হয় এর ৩০৯ সংখ্যক পৃষ্ঠায়। পরে 'ছায়ানট' গ্রন্থের প্রথম ও 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কবিতা সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> ১৯২২ সালের ২২ মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে লিখিত নজরুলের 'বিজয়িনী' কবিতাই প্রমীলা সেনগুপ্তার সহিত তার প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা।[১৯]

'ছায়ানটে' কবিতার নিচে রচনার স্থান ও তারিখ মুদ্রিত হয় যথাক্রমে কুমিল্লা ও

---

১৯. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *প্রাগুক্ত*; পৃ. ২৮০

ও অগ্রহায়ণ ১৩২৮। 'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠের সঙ্গে 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থের[২০] পাঠে শুধুমাত্র রাণী > রানী'র এই বানান ভিন্নতা ছাড়া আর কোনই পাঠভেদ নেই। কিন্তু 'ছায়ানটে' বেশ কয়েকটি স্থানে পাঠভিন্নতা দেখা যায়। যেমন :

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ :

'ক্লান্তি আনে, দিনে দিনে হ'য়ে ওঠে ভারী,'

'ছায়ানটে'র পাঠ :

' দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী,'

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ :

'ওগো দেবি !'

'ছায়ানটের পাঠ :

'ও গো জীবন-দেবি !'

এছাড়াও পত্রিকার 'টল-মল' গ্রন্থে হয়েছে 'টলমল' এবং সাময়িকীর 'পূরে' মুদ্রণ প্রমাদটি শুদ্ধ হয়ে বইয়ে 'পুরে' মুদ্রিত হয়।

নিরুদ্দেশের যাত্রী

মাসিক 'নারায়ণ' পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার (চৈত্র ১৩২৭) ৪৭৮ সংখ্যক পৃষ্ঠার শেষ-অর্ধ এবং ৪৭৯ সংখ্যক পৃষ্ঠার প্রথম-অর্ধ পৃষ্ঠা জুড়ে 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' কবিতাটি মুদ্রিত হয়। পরে একই শিরোনামে 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। পত্রিকায় শিরোনামের নীচে বন্ধনী চিহ্নে 'বাউল-কাশ্মিরী খেমটা' কথাগুলো মুদ্রিত ছিলো, গ্রন্থে তা নেই। কবিতাটির শেষ পর্যায়ে একটি স্তবকে উল্লেখযোগ্য পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

'নারায়ণে' মুদ্রিত পাঠ :

আস্‌লো বাদল রাতের কাঁদা,

---

২০. নজরুল ইসলাম, *পূবের হাওয়া*, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৪, প্রকাশক : এ আর খান, ২৪/২৫ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা ; পৃ. ৪৯

ভোরে তারা কনক গাঁদা
হাস্‌লো, ও মোর টুটলো ধাঁধা–
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো?

'ছায়ানটে'র প্রথম মুদ্রিত পাঠ :

থাম্‌ল বাদল রাতের কাঁদা,
হাসলো, আমার টুটলো ধাঁধা–
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো?

'পূবের হাওয়া'র ২য় সংস্করণের পাঠ :

থাম্‌লো বাদল রাতের কাঁদা,
ভোরের তারা কনক গাঁদা
ফুট্‌লো, ও মোর টুটলো ধাঁধা–
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো?

উপরে উল্লিখিত স্তবকের পাঠভেদ ছাড়াও —

'নারায়ণে'র পাঠ –

'আমি খুঁজি কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো!'

'ছায়ানটে'র পাঠ –

'খুঁজে বেড়াই কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো!'

'পূবের হাওয়া'র পাঠ –

'আমি খুঁজি কোন আঙনে কাঁকন বাজে গো!'

কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তির অব্যবহিত পূর্বের পঙ্‌ক্তিতেও 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের পাঠে 'আমি' সংযুক্ত হয়েছে –

'আমি এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যা-তারার চলার পথে গো!'

পত্রিকা বা 'পূবের হাওয়া'র পাঠে 'আমি' পদটি ছিলো না! 'নারায়ণে'র পাঠের

সঙ্গে গ্রন্থ দুটোর পাঠে কয়েকটি বানান শুদ্ধি দেখা যায়। যেমন সুরু > শুরু, মুহূর্মুহু > মুহূর্মুহূ ইত্যাদি।

দহন-মালা

'দহন-মালা' কবিতাটি 'নারায়ণ' মাসিক সাহিত্য সাময়িকীর ৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার (বৈশাখ ১৩২৮) ৬৬২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। পরে তা গ্রন্থভুক্ত হয় 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'য়। এ কবিতার উল্লেখযোগ্য কোন পাঠভেদ নেই – দু' একটি স্তবক বিন্যাসের ব্যতিক্রম ছাড়া। এ রকম ব্যতিক্রমের দুটো উল্লেখ নিচে করা হলো :

'নায়ারণে'র পাঠ –

' দুহাত পুরে, আনলে ও কি সোহাগ-ক্ষীরের থালা,
আহা দুখের বরণ-ডালা?

'ছায়ানটে' প্রথম মুদ্রিত পাঠ –

দুহাত পুরে, আনলে ওকি সোহাগ-ক্ষীরের থালা,
আহা দুখের বরণ-ডালা?

'পূবের হাওয়া'র পাঠ (২য় সংস্করণ) –

দু'হাত ভরে, আনলে ও কি সোহাগ- ক্ষীরের থালা?
আহা দুখের বরণ ডালা?

সর্বশেষে পঙ্‌ক্তি দুটোর বিন্যাস –

'নারায়ণে'—

কল্যাণী! হায় কেম্‌নে তোমার
দেবো যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা।

'ছায়ানটে'—

কল্যাণী! হায় কেম্‌নে তোমায় দেবো

যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন গালা।

'পূবের হাওয়া'য় -

কল্যাণী! হায় কেম্‌নে তোমার দেবো যে বেষ পান করেছি

নীলের নয়ন-গালা।

এছাড়া পত্রিকার 'দুচোক' শব্দটি গ্রন্থে 'দুচোখ' করা হয়েছে।

অনাদৃতা

মাসিক 'নারায়ণ' পত্রিকার ৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যার (ভাদ্র ১৩২৮) ১০১৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা ব্যাপী কাজী নজরুল ইসলামের 'অনাদৃতা' শিরোনামে কবিতা প্রকাশিত হয়। 'ছায়ানটে' অন্তর্ভুক্তির সময় শিরোনামের পরিবর্তন না হলেও 'পুবের হাওয়া' গ্রন্থভুক্তির সময় কবিতাটির নামকরণ করা হয় 'অভিমানিনী'। 'ছায়ানটের আর একটি কবিতা 'অ-বেলা'য়, 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থে 'অনাদৃতা' নামে স্থান পায়। সে-যা হোক, 'অনাদৃতা' বা 'অভিমানিনী' কবিতা সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

> এই কবিতা দুটির [অভিমনিনী ও স্নেহাতুর] সমস্ত কথা শ্রীযুক্ত বিরজাসুন্দরী দেবীর, নজরুল শুধু সেই কথাগুলি ছন্দে গেঁথেছেন। তার একটি কবিতার নাম 'অভিমানিনী'! শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরীর একটি মেয়ে ছিল খুব অভিমানিনী; অসুখে সে মারা যায়। মরবার কিছুক্ষণ আগেও সে অভিমান করে কথা বন্ধ করেছিল। সেই অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে।[২১]

'নারায়ণ', 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র পাঠে তেমন বড় ধরনের কোন পাঠ-ব্যতিক্রম নেই এই কবিতায়। সামান্য পাঠভেদ যা আছে তা এরকম :

'নারায়ণে'র পাঠ

১) আহা ভোলা কি তা যায়?

২) নিজেই সইলি ব্যথা রে,

৩) কাঁটার মতন বেঁধে!

---

২১. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

'ছায়ানটে'র পাঠ

১) ভোলা কি তা যায়?

২) নিজেই সইলি ব্যথা রে,

৩) কাঁটার মত বেঁধে!

'পূবের হাওয়া'র পাঠ

১) আহা ভোলা কি তা যায়?

২) নিজেই সইলি ব্যথা,

৩) কাঁটার মত বেঁধে!

অকরুণ পিয়া

'নারায়ণ' মাসিক সাহিত্য সাময়িকীর ৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যার (আশ্বিন ১৩২৮) ১১১০ পৃষ্ঠায় কাজী নজরুলের 'অকরুণ পিয়া' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'ছায়ানটে' একই শিরোনামে তা স্থান পায়। তাতে স্থান ও তারিখ যথাক্রমে কলিকাতা ও শ্রাবণ ১৩২৮ মুদ্রিত হয়। পরে 'পূবের হাওয়া'তেও কবিতাটি গৃহীত হয়। 'বিদায় বাঁশী' শিরোনামে। কবিতাটির পাঠভেদ নেই কোন মুদ্রণেই। শুধু পত্রিকায় ছাপা ছিলো 'ঈর্ষাভরা' দুটো গ্রন্থে বানানটি 'ঈর্ষ্যাভরা' হিসেবে ছাপা হয়।

চির শিশু

নজরুলের 'চির-শিশু' কবিতাটি 'নারায়ণ' পত্রিকার ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩২৯) মুদ্রিত হয়। একই শিরোনামে তা 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হলেও 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থভুক্তির সময় এর নাম হয় 'পথিক শিশু'। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জানাচ্ছেন যে, শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কবি নজরুল আমন্ত্রিত হন এবং শ্রীমতী বসুর মেয়ের জন্মদিনের উপহার হিসেবে 'চির-শিশু' বা

'পথিক শিশু' নামে একটি 'গান' রচনা করেন।[২২] 'ছায়ানটে' কবিতা রচনার যে সময়ের কথা উল্লেখ আছে তা ফাল্গুন ১৩২৭, কলিকাতা।

'নারায়ণে'র মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে 'ছায়ানটে'র মুদ্রিত পাঠে সামান্য পার্থক্য আছে। যেমন :

'নারায়ণে'র পাঠ –

১) 'ছিলি ও'র এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে।।'

২) 'ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে, উঠ্‌ছে কেন মন ভরায়ে?'

এই পঙ্‌ক্তি দুটো যথাক্রমে প্রতিটি দুটো পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত হয়ে 'ছায়ানটে' স্থান পেয়েছে। যেমন :

'ছায়ানটে'র পাঠ –

১) 'ছিলি ওরে এলি ওরে
বারে বারে নাম হারায়ে।।'

২) 'ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে,
উঠ্‌ছে কেন মন ভরায়ে?'

এছাড়া পত্রিকার 'কান্না–সাগর' বইয়ে 'কান্না–সায়র' হয়েছে ; নূতন › নতুন, বারায়ে › বাড়ায়ে হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে।

'নারায়ণ' পত্রিকার পাঠের সঙ্গে 'ছায়ানটে'র পাঠের এই বৈসাদৃশ্যটুকু ছাড়া আর কোন ব্যত্যয় নেই। কিন্তু 'পূবের হাওয়া'র পাঠের সঙ্গে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। কবিতার সর্বশেষ স্তবকে এই পাঠভেদ স্পষ্ট –

'নারায়ণে'র পাঠ :

আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না–সাগর উথ্‌লে বুকে,
নূতন নামে ডাকতে তোকে

---

২২. ঐ, পৃ. ৯২

ওরে ওকে কণ্ঠ রুখে, উঠছে কেন মন ভারায়ে?

অস্ত হতে এলে পথিক উদয়-পানে পা বারায়ে।।

'পূবের হাওয়া'র পাঠ :

আজ কেন রে নিবিড় সুখে

কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে,

নতুন নামে ডাকতে তোকে

ওরে ওকে কণ্ঠ রুখে, পাঁচ-ফাগুনের যুঁই-চারা এ!

আজ মন-পাখী ধায় মধুরতম নাম আশীষের শেষ ছাড়ায়ে।।

হারা-মণি

'নারায়ণ' সাহিত্য সাময়িকীর ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যার (কার্তিক ১৩২৮) ১২১৬ ও ১২১৭ পৃষ্ঠায় নজরুলের 'হারা-মণি' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। পরে তা 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে স্থানলাভ করে। আরও পরে 'শ্নেহাতুর' (স্নেহাতুর) নামে 'পূবের হাওয়া' গ্রন্থভুক্ত হয়। দীর্ঘ এ কবিতার তেমন কোন পাঠভেদ নেই। দু'একটি ছোট-খাটো পাঠ-ব্যতিক্রম এরকম :

'নায়ারণে'র পাঠ

১) আমার মলিন ঘরের

২) জন্ম জন্ম এমন ক'রে

৩) আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে

৪) আহা গৃহ-হারা বাছা

৫) ওরে আজকে আমার অঙ্গনে

৬) হে মোর স্নেহের কাঙালী!!

'ছায়ানটে'র পাঠ

১) আমার মলিন ঘরের

২) জন্ম জন্ম এমন ক'রে

৩) আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে

৪) গৃহ-হারা বাছা

৫) আজকে আমার অঙ্গনে

৬) মোর স্নেহের কাঙালী!!

'পূবের হাওয়া'র পাঠ

১) মলিন ঘরের

২) জন্ম এমন ক'রে

৩) আজ ধরা দিয়ে

৪) আহা গৃহ-হারা বাছা

৫) ওরে আমার অঙ্গনে

৬) হে মোর স্নেহের কাঙালী!!

বাদল-দিনে

'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকার ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩২৮) প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের 'বাদল-দিনে'। কবিতাটি সাময়িকীর ৮৮ পৃষ্ঠায় দুই সারিতে (Double Column) ছাপা হয়। এই নামে 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময় কবিতার নিচে রচনার স্থান ও তারিখ মুদ্রিত হয় যথাক্রমে কলিকাতা ও শ্রাবণ ১৩২৮। পরে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'বরষায়' নামে 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটিকে স্থান দেয়া হয়।

'ছায়ানটে'র মুদ্রিত পাঠের সঙ্গে সাময়িকীতে প্রকাশিত পাঠের কোন ব্যতিক্রম নেই। যতিচিহ্নেরও প্রায় মিল রয়েছে এখানে। তবে হাইফেন ব্যবহারে শব্দ-সাযুজ্যের ব্যাপারে কোথাও খানিকটা ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ–

১) আদর গর গর

২) বরিষা জর জর

৩) কাজরী নাচা নাচে

৪) সুরভি কেয়া ফুলে

৫) মরিব লেখা–শেষে

'ছায়ানাটে'র পাঠ

১) আদর–গর–গর

২) বরিষা–জর–জর

৩) কাজরী–নাচা নাচে

৪) সুরভি কেয়া–ফুলে

৫) মরিব লেখা শেষে

উপরে যে পাঠ–ভিন্নতা দেখানো গেলো, 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'ছায়ানটে'র মুদ্রিত পাঠের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তা বড় কোন ভেদ নয়। তুলনায়, 'ছায়ানট' ও 'পূবের হওয়া' গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠে হাইফেন ব্যবহার ও শব্দ–সাযুজ্য প্রক্রিয়া ব্যাপক রকমফের লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করতে হলে কবিতার পাঠ দুটো পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করাই শ্রেয়। এখানে প্রধানত দুটো পাঠভেদই শনাক্ত করে তুলে ধরা হচ্ছে। এর একটি 'বরষায়' শিরোনামে 'পূবের হাওয়া'য় মুদ্রিত কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি তিন পঙ্‌ক্তির। অথচ 'ছায়ানটে'র 'বাদল–দিনে' কবিতায় তা চার পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট। যেমন :

'বাদল–দিনে'র পাঠ–

নয়ন ঢল–ঢল

সজল ছল–ছল,

কাজল কালো জল

ঝরে লো ঝর–ঝর।।

'বরষায়'– এর পাঠ

নয়ন ঢল ঢল

কাজল-কালো জল

ঝরে লো ঝর ঝর।।

মনে হয়, ছাপার সময় এখানে 'সজল ছল-ছল পঙ্‌ক্তিটি বাঁদ পড়েছে। কারণ কবিতাটির আর কোথাও তিন পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট স্তবক নেই। চার ও দুই পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট স্তবকে বিন্যস্ত কবিতায় তিন পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট একটি স্তবক না-থাকারই কথা। তাছাড়া পরিত্যক্ত পঙ্‌ক্তিটির অর্থগত অসাম্যও লক্ষ্য করা যায় না।

অন্য যে পাঠভেদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো, 'ছায়ানট' থেকে 'পূবের হাওয়া'য় অন্তর্ভুক্তির সময় কবিতাটির নাম বদলের সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তিও বর্জন করা হয়েছে। পরিবর্জিত পঙ্‌ক্তিগুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

কাহার ও-মেঘোপরি গমন গম গম?

সখি রে মরি মরি, ভয়ে গা ছম ছম!

গগনে ঘন ঘন

সঘরেন শোন শোন -

ঝনন রণ রণ -

সজনি ধর ধর।।

জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে,

কাজরী-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে।

শ্যামল মুখ স্মরি'

সখিয়া বুক মোরি

উঠিছে ব্যথা ভরি'

আঁখিয়া ভর ভর।।

বিজুরী হানে ছুরি চমকি' রহি রহি

বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি!

'বরিষা-জর-জর' পঙ্‌ক্তির অব্যবহিত পরে এবং 'সুরভি কেয়া-ফুলে'র অব্যবহিত পূর্বে এই পঙ্‌ক্তিগুলো 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের 'বাদল-দিনে' কবিতায় ছিলো।

বিরহ-বিধুরা

'বিরহ-বিধুরা' কবিতাটি 'মোস্‌লেম ভারতে'র ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার (মাঘ, ১৩২৭) প্রথমেই ছাপা হয় ; অবশ্য পৃষ্ঠার বিচারে ৬২৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা। পরে 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থে তা স্থান পায়। কাবুলের কবি 'খোশহাল' হিন্দুস্থানে নির্বাসনকালীন তাঁর স্ত্রীর রচিত একটি কবিতার ভাব অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'বিরহ-বিধুরা' কবিতা রচনা করেন। পাদটীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন : ' কাবুলী-কবি 'খোশহাল'-এর হিন্দুস্থানে নির্বাসন-কালীন তাঁহার সহধর্ম্মিনীর লিখিত একটী কবিতার ভাব অবলম্বনে'। এখানে মূল কবিতার নাম বা রচয়িতা খোশহালের স্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। 'পূবের হাওয়া'য় কবিতাটি অন্তর্ভুক্তির সময় এই পাদটীকা পরিবর্জিত হয়। সাময়িকীতে প্রকাশিত কবিতার পাঠের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত পাঠের কোন পাঠভেদ নেই ; এমন কি যতিচিহ্নেরও পরিবর্তন দেখা যায় না।

নিকটে

'মোস্‌লেম ভারতে'র ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২৭) ১৭৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'বাদল প্রাতের শরাব'। এই কবিতাটি পরে 'নিকটে' শিরোনামে 'পূবের হাওয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'নুতন সংস্করণ' (১৯৯৩) রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে কবিতাটি, 'নিকটে' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হলেও আবদুল কাদির সম্পাদিত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (১৯৬৬) কবিতাটি 'বাদল-প্রাতের শরাব' শিরোনামেই অন্তর্ভুক্ত হয়।[২৩] কবিতার শিরোনামের নিচে বন্ধনীতে উল্লেখ ছিলো 'হাফিজ-এর ছন্দ ও ভাব অবলম্বনে' কবিতাটি রচিত। কিন্তু গ্রন্থভুক্তির সময় এই উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়। পত্রিকা ও গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠে কোন পাঠভেদ নেই। শুধু প্রথম পঙ্‌ক্তিতে পত্রিকার 'কান্তা' গ্রন্থে 'কান্ত' মুদ্রিত হয়েছে। এটা যে মুদ্রণ প্রমাদ তা নিশ্চিত হওয়া যায় কবিতাটির ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তিতেও 'কান্তা' শব্দটি অক্ষুণ্ণ আছে দেখে।

---

২৩. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত* , পৃ. ২২৫

মোহিতলাল মজুমদার কবিতাটি প্রশংসা করে লিখেছিলেন :

> 'বাদল-প্রাতের শরাব' শীর্ষক কবিতায় ইরানের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাটিও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।[২৪]

ফণিমনসা

দিল-দরদী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা পড়ে নজরুল এই কবিতাটি রচনা করেন। 'মোস্‌লেম ভারতে'র ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩২৮) প্রকাশিত 'দিল দরদী' কবিতার শিরোনামের নিচে বন্ধনীতে উল্লেখ ছিলো : 'গত ভাদ্র মাসের 'মোস্‌লেম ভারতে' সত্য-কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখী' শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া।' নজরুলের সঙ্গে সত্যেন দত্তের সম্পর্কের গভীরতা উল্লেখ করেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ :

> কাজী নজরুল ইসলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে শ্রদ্ধা করত, ভালোও সে বাসত তাঁকে। 'খাঁচার পাখী' কবিতাটি পড়ে তার মন খুবই ব্যথিত হয়ে উঠল। সে লিখল, 'দিল-দরদী' নাম দিয়ে একটি কবিতা।[২৫]

তিনি আরও লিখেছেন :

> কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের চোখের অতি সরু নাড়ীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল। এই জন্যে চোখে তিনি ঝাপসা দেখছিলেন। সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যে তিনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবেন। এই সময়ে তিনি [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত] 'খাঁচার পাখী' কবিতাটি লিখেন।[২৬]

নজরুলের 'দিল-দরদী' কবিতাটি ছাপা হবার পর সত্যেন দত্ত তাঁর সঙ্গে দেখা

---

২৪. মোজাম্মেল হক (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত।*

২৫. মুজফ্‌ফর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

২৬. *প্রাগুক্ত*; পৃ. ১৪৭

করতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাসায় গিয়ে দুজনের কাউকেই পাননি। এর অল্পদিন পর ১০ আষাঢ় ১৩২৯ (২৪ জুন ১৯২২) তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

'দিল-দরদী' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পরে রচিত সতেন্দ্র-প্রশস্তিমূলক কবিতা 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ', 'সত্য-কবি' ও 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি'ও কাব্যগ্রন্থটিতে সংযুক্ত হয়। এগুলোর রচনাকাল : শ্রাবণ ১৩২৯ ।

'ফণি-মনসা'র প্রথম মুদ্রিত কপি আমরা দেখিনি। 'নজরুল ইন্‌স্টিটিউটে' (ঢাকা) একটি আদি গ্রন্থের ফটোকপি আছে। এখানে প্রকাশকালের উল্লেখ নেই। তবে গ্রন্থটি পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুদ্রিত। কারণ, বইটি ১৫ রাজেন্দ্র লাল স্ট্রিট, কলিকাতা-৬ থেকে প্রমীলা নজরুল ইসলাম প্রকাশ করলেও 'পাকিস্তানে একমাত্র পরিবেশক' হিসেবে কুমিল্লার একটি বুক এজেন্সির নাম এতে মুদ্রিত আছে। বাংলা একাডেমী (ঢাকা) যে নতুন সংস্করণ নজরুল-রচনাবলী প্রকাশ করেছে তাতে গ্রন্থের প্রথম মুদ্রিত পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে বলে পরিশিষ্ট থেকে জানা যায়।[২৭] কিন্তু 'দীল-দরদী' কবিতার পাঠ 'মোস্‌লেম ভারতে'র সঙ্গে 'নজরুল ইন্‌স্টিটিউটে' রক্ষিত ফটোকপিটিরই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ, রচনাবলীর দাবিকৃত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নয়। যেমন :

মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ -

চৈতালীতে বৈকালী সুর গাইলে -
'নিজের নই মালিক,

নজরুল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত গ্রন্থের ফটোকপির পাঠ -

চৈতালীতে বৈকালী সুর গাইলে
নিজের নই মালিক,

নতুন সংস্করণ রচনাবলীর পাঠ —

চৈতালিতে বৈকালি সুর
গাইলে, 'নিজের নাই মালিক',

---

২৭. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী*, নতুন সংস্করণ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১৫

কবিতার আরো একটি স্তবকেও এরকমই পার্থক্য :

'মোস্‌লেম ভারতে'র পাঠ –

বসন্ত তো কতই এলো, গেল
খাঁচার পাশ দিয়ে,

নজরুল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত গ্রন্থের ফটোকপির পাঠ –

বসন্ত তো কতই এলো, গেল
খাঁচার পাশ দিয়ে,

নতুন সংস্করণ রচনাবলীতে দেখছি —

বসন্ত তো কতই এলো,
গেল খাঁচার পাশ দিয়ে,

অন্যত্র, 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'নজরুল ইনস্টিটিউটে' রক্ষিত গ্রন্থের ফটোকপিতে 'সে সুধা ভর্‌-পুর্‌-খুনই' আছে ; কিন্তু রচনাবলীর পাঠ 'সে সুধা ভর্‌পুর-খুনই'। এ থেকে মনে হয়, নজরুল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত ফটোকপিটির পাঠই অন্তত এই কবিতার সাময়িকীতে প্রকাশের অব্যবহিত পরের পাঠ নয়। আদি গ্রন্থের যে ফটোকপিটি নজরুল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত আছে তাতে কবিতার সংখ্যা বিশটি। রচনাবলীতে 'ফনি-মনসা'র তেইশটি কবিতা আছে। কবিতার শিরোনাম ও বিন্যাসেও পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

'দিল-দরদী' কবিতায় পাঠভেদ খুব বেশি নেই। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কবিতার সর্বশেষ স্তবকের পরিবর্তন :

'মোস্‌লেম ভারতে' আছে :

বাদ্‌শা-কবি! সালাম জানায়
বুনো তোমার ছোট্ট ভাই!-
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
যায় ডুবে হায় সব কথাই!

'ফণি-মনসা'য় হয়েছে :

বাদ্‌শা-কবি ! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি !

কবিতার প্রথম দিকে দুটো শব্দ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ; এর একটি হলো : 'মোস্‌লেম ভারতে'—

দর্‌দ্‌-আলুদা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে।

গ্রন্থে এই পাঠ

দর্‌দ্‌-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে।

অন্যটি :

পত্রিকার 'সোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া' গ্রন্থে হয়েছে 'দোস্ত হয়ে দখিন হাওয়া'।

মুজফ্‌ফর আহমদ জানিয়েছেন যে, কবিতার শেষ স্তবকের পরিবর্তন সম্ভবত কবির নিজের করা, তবে 'দর্‌দ্‌-আলুদা' কে 'দর্‌দ্‌-ভেজা' করেছেন তা তিনি জানেন না।[২৮] আমাদের মনে হয়, এটাও কবির কীর্তি। ছন্দ-গতির দিক থেকে কবিতাতে পরিবর্তিত পাঠই শ্রেয়তর বলে মনে হয়। তবে 'সোস্ত' যে 'দোস্ত' হয়েছে, অর্থের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় তা কবির নিজ হাতে হয়নি। 'মোস্‌লেম ভারতে' কবিতায় কোন স্তবক বিন্যাস ছিলো না, গ্রন্থে চার পঙ্‌ক্তিতে এক একটি স্তবক বিন্যস্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে।

২৮. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

সিন্ধু-হিন্দোল

পথের স্মৃতি

'ছায়ানট' শিরোনাম 'নারায়ণ' পত্রিকার মাঘ ১৩২৭ সনের ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার ৩৩৩ পৃষ্ঠায় 'পথের স্মৃতি' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'নারায়ণে' এর আগে নজরুল ইসলামের গান বা রচনা-প্রসঙ্গ স্থান পেলেও এটাই তার প্রথম কবিতা-প্রকাশ। পরবর্তীকালে 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি স্থান পায়।

কতিপয় যতিচিহ্নের পরিবর্তন ও একটি স্তবকের পুনর্বিন্যাস ছাড়া পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার পাঠের সঙ্গে গ্রন্থভুক্ত কবিতার কোন পাঠভেদ নেই। নিচে উল্লিখিত স্তবকের বিন্যাস-পরিবর্তন তুলে ধরা হলো ঃ

'নারায়ণে'র বিন্যাস :

এই যে মোদের একটু চেনার
আবছায়াতেই বেদন জাগে,
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া
পূবের হাওয়ার কাঁপন লাগে ;

'সিন্ধু-হিন্দোল'-এর পুনর্বিন্যাস ঃ

এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে,
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পূবের হাওয়ার কাঁপন লাগে;

পত্রিকায় নজরুল-প্রসঙ্গ আলোচনা

সাময়িক পত্রিকাগুলোতে সাধারণত একটি বিভাগই থাকে আলোচনার জন্যে, যেখানে কবিতা গল্প বা অন্য কোন লেখা নিয়ে মন্তব্য করেন ওই পত্রিকা সংশ্লিষ্টই কোন ব্যক্তি। আবার 'সমালোচনা' নামে বিভাগ করে তাতে বই বা পত্র-পত্রিকার

আলোচনাও কোন কোন সাময়িকীতে স্থান পায়। আসলে একটি সাময়িক পত্রিকাকে নানাভাবে সুসজ্জিত করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে কোন কালেই কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ব্যত্যয় ছিলো না, যেমনি এখনও নেই। 'নারায়ণ', 'মোস্‌লেম ভারত' এবং 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকাতেও এ রকম আলোচনা ছাপা হতে দেখা যায়। কিন্তু এগুলোর শিরোনামা যে সব সময় 'আলোচনা' বা 'সমালোচনা' ছিলো এমন নয়। 'একটি চিঠি', 'পঞ্চ প্রদীপ' ইত্যাদি শীর্ষনামেও কবি-লেখকদের রচনা সম্পর্কে মত-অমত প্রদত্ত হয়েছে এসব পত্রিকাতে। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এগুলোতে। অবশ্য ঋণ স্বীকার ছিলো যথাস্থানে অথবা থাকতো প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে সাধারণত ওই সমস্ত রচনাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো যেগুলো সমকালে কোনভাবে ব্যতিক্রমী বা উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে উঠতো।

নারায়ণ

কাজী নজরুল ইসলামের লেখক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার অনেক আগেই 'নারায়ণ' মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নজরুলের নাম প্রথম যখন 'নারায়ণে'র পৃষ্ঠায় ছাপা হয় তখন পত্রিকাটি দাপটের সঙ্গে ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করেছে। এই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক তিনি পরবর্তীকালে হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রথমে 'নারায়ণে'র পাতায় নজরুলের উপন্যাসের আলোচনা দিয়েই তাঁর 'নারায়ণে'র লেখার জগতে প্রবেশ। 'নারায়ণের নিকষ-মণি' নামে সাময়িকীতে বই ও পত্রিকা আলোচনার একটি বিভাগ ছিলো। মোজাম্মেল হক্ সম্পাদিত 'মোস্‌লেম ভারত' তখন্ প্রকাশিত হয়েছে এবং অনুমান করি, 'নারায়ণ' অফিসেও প্রথম থেকেই এর সংখ্যা পাঠানো হচ্ছিলো। 'নারায়ণ' কর্তৃপক্ষ পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩২৭) 'মোস্‌লেম ভারতে'র ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭) নিয়ে এক দীর্ঘ প্রশংসামূলক আলোচনা করেন 'নারায়ণের নিকষ-মণি' বিভাগে। ওই সংখ্যা 'মোস্‌লেম ভারতে' নানা প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনা প্রকাশ পেলেও 'নারায়ণ' কর্তৃপক্ষ তার মধ্যে মাত্র তিনটি লেখার উপর সুদীর্ঘ মন্তব্য করেন। এর প্রথম লেখাটি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'ইউরোপ আক্রমণ' শীর্ষক কবিতা, দ্বিতীয় লেখাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের প্রকাশিত কিস্তি আর তৃতীয় রচনাটি নাম অনুল্লিখিত জনৈক লেখকের 'নবযুগের কথা'।

'বাঁধন-হারা' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'নারায়ণ' পত্রিকার ৯৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয় :

> বাঁধনহারা বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস – অবিবাহিত দ্বিপদ ; বিবাহিত চতুষ্পদ,– "একেবারে মাটির সঙ্গে জয়েন! তারপর দৈবক্রমে যদি একটি সন্তান এসে জুটল তা' হলে হল সে একটি ষট্পদ মক্ষিকা – সর্ব্বদাই আহরণে ব্যস্ত। আর একটি বংশ বৃদ্ধি হলেই অষ্টাপদ পিপীলিকা ... তারপর নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত গিন্নী যখন এক সন্তান প্রসব করে ফেললেন, বেচারা পুরুষ তখন হয়ে গেল, একেবারে বহুপদ বিশিষ্ট একটি অলস কেন্নো! কোন বস্তু নেই – ছুঁলেই জড়সড়!" বাঁধনহারার বর্ণনাটি খাঁটি কবিত্বে মোহনীয় – "আবার যেখানে ইচ্ছা করে ধরা দিতে গিয়েছিস, সেইখানেই কার নিষ্ঠুর হাত এসে তোকে ... মুক্ত করে দিয়েছে। সে কোন্ চঞ্চলের যেন তুই ছাড়া হরিণ!" মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ? তাহার পর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন জলতরঙ্গ আছে— উপমাগুলি মন মাতান।

এইটুকু উল্লেখ এবং নজরুলের গদ্যরচনার কাব্যগুণ আর বর্ণনার জলতরঙ্গের প্রশংসাই শুধু নয়, ওই সংখ্যা 'মোস্লেম ভারত' সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারেও এসেছে তাঁর 'বাঁধন-হারা'র প্রসঙ্গ। 'নারায়ণ' পত্রিকার ৯৯৯ পৃষ্ঠা থেকে নিচে তা উদ্ধৃত করা গেলো :

> ঠিক বলিয়াছ ভাই, আজ একটি 'চরম ও পরম' লক্ষ্য স্থির করিয়া জীবনের বসন্তের 'রঙ্গীন স্বপ্ন' দেখিতে হইবে। এটা যে পাগলের যুগ, সোজা মানুষের দিন গিয়াছে। সুসাধ্য সাধন ফুরাইয়াছে। সে স্বপ্ন দেখিতে ভয় পায় না, সেই পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘাইতে পারে, মূককে বাচাল করে। তবে এস ভাই আজ সকলে মিলিয়া মরা বাঁচাইবার বল ধরা সেই ত্রিলোকস্পর্শী ডাক দিই, মৃত রণাঙ্গন সজীব হউক। চিরন্তনের সত্য বন্ধনে সকল বন্ধন টুটিয়া যাক, বাঁধনহারা'র মগন মুক্তিতে ও প্রেরণায় সিন্ধু বুকে বাসনার মুক্তি লয় হউক, লয় হউক।

'মোস্লেম ভারতে'র উল্লিখিত সংখ্যার মতো ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যাও (শ্রাবণ ১৩২৭) 'নারায়ণ' অফিসে পাঠানো হয়েছিলো ওই সংখ্যার 'মোস্লেম ভারতে' বহু প্রখ্যাত ব্যক্তির রচনা স্থান পায়। কিন্তু 'নারায়ণ' কর্তৃপক্ষের আলোচনায় এঁদের সবার প্রসঙ্গ আসেনি। ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ সংখ্যা (কার্তিক ১৩২৭) 'নারায়ণে' 'নারায়ণের

নিকষ-মণি' বিভাগে উক্ত সংখ্যা 'মোস্‌লেম ভারত' থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'বাদল বরিষণে', তরিকুল আলমের 'আমাদের শিক্ষা সমস্যা', হেমলতা দেবীর 'বোঝা বওয়া', সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'নবীনের গান' এবং নজরুল ইসলামের 'খেয়া-পারের তরণী'র কবিতার সম্পূরক চিত্রের আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই সম্পূর্ণ আলোচনার অর্ধেকেরও বেশি স্থান জুড়ে এসেছে নজরুল ইসলামের লেখা-প্রসঙ্গ। উল্লিখিত সংখ্যার 'মোস্‌লেম ভারতে' প্রকাশিত প্রথম লেখাই কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'খেয়া-পারের তরণী'। চিত্রশিল্পী নওয়াব কন্যা মেহেরবানু খানমের আঁকা যে চিত্র অবলম্বন করে কবিতাটি রচিত সে চিত্র ওই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। শিল্পী ঢাকার স্যার নওয়াব আহ্‌সানউল্লাহর তনয়া এবং স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহর ভগ্নি। তাঁর স্বামী খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম। কিন্তু 'নারায়ণ' পত্রিকার আলোচক 'মোস্‌লেম ভারতে'র শ্রাবণ ১৩২৭ সংখ্যা আলোচনাকালে শিল্পীকে 'একটি ছোট মেয়ে' বলে উল্লেখ করেছেন। শিল্পী যে পরিবারের কন্যা ও 'খান বাহাদুরে'র পত্নী এ পরিচয়টি তুলে ধরাই সঙ্গত ছিলো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সম্পূরক এই চিত্রালোচনার (১২০৩ পৃষ্ঠা) সূত্রেই তাঁর 'বাদল-বরিষণে' সম্পর্কে আলোচনার ধারাপাত ঘটে 'নারায়ণ' পত্রিকায় :

> শ্রাবণের 'মসলেম ভারত' পেয়েছি। গোড়ায় একটি ছোট মেয়ের আঁকা ছবি – খেয়াপার' ; নজরুল ইসলাম তার উপযোগী কবিতা লিখেছেন। 'ভয়ানাং ভয়ম্ ভীষণং ভীষণানাম্'- এর একটা টান আছে ; ভগবানের রুদ্র উদ্যতবজ্র রূপ গোড়ায় সাধকের ভাল লাগে। কিন্তু যে আপ্ত যে ভগবানকে পেয়েছে, সে ভীষণের মাঝেও সুন্দরকেই দেখে – ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর আর কি ভয় থাকে? পাপ পুণ্য এসব বঁধুর সঙ্গে চেনাচেনির – অভাবের কথা।
>
> তারপর ভাল জিনিস হচ্ছে নজরুল ইসলামের বাদল বরিষণে।— 'আমার এই বেদনা বর্ষার সুরে বাঁধা .... 'এটা শ্রাবণ মাস, না? আহা, তাই অন্তরে আমার বরিষণের ব্যথাটুকু ঘনিয়ে আসছে।'
>
> এই বর্ষায় ব্যথিত জনের শেষে কাজরীর সঙ্গে দেখা – সে 'কাজরিয়া' কালো – শ্যামাঙ্গিনী। প্রথম দর্শনে মন হারান যে কি জিনিস তা লেখক বেশ বলেছেন — 'এই এক পলকের আধখানি চাওয়ায় কেমন করে মানুষ এত চির পরিচিত হয়ে যেতে পারে?' .... 'নীচে শ্যামল দুর্ব্বায় দাঁড়িয়ে বিনুণী-বেণীদোলনে সুন্দরীরা মৃদঙ্গে তাল দিয়ে গাচ্ছিল কচি ঘাসের আর সবুজ ধানের গান। ... ... দেখলাম

> সেই কালো কাজরিয়া – দোলনা ছেড়ে আমার পানে সজল চোখের চেনা চাউনী নিয়ে চেয়ে আছে।' ... .. 'যে কথাটি হয়তো সারা জীবন চোখের জলে ভেসেও বলা হতো না, এক নিমেষে চারটি চোখের অনিমিখ চাউনীতে তা বলা হয়ে গেল।'
>
> তারপর মিলনের আশা পেয়ে নিজে কুৎসিত বলে তার কান্না! সে বড় অপূর্ব্ব জিনিস! 'ময় কারী কাজরীয়া হুঁ – ওগো সুন্দর, আমি কালো।' রূপহীনার এই বেদনা বড় সুন্দর বেজেছে। এমন আকুল প্রণয়ে মিলন কদাচিৎ হয়, কারণ এত প্রেম যে নিজেই নিবিড়তম মিলন, নিজেই নিজের সার্থকতা। তাই – 'সবুজ মাঠ, পথহারা দিগন্তে, ... শ্রাবণ প্রীতে ধানের মাঝে বসে গাইছি, – 'আমার নয়ন ভুলানো এলে!' তাই এ কাজরী প্রণয়ের পরিণাম হলো – 'বাদল ভেজা তারই স্মৃতি'।

'মোস্‌লেম ভারতে'র ওই সংখ্যায় প্রকাশিত এই দীর্ঘ আলোচনাটির পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। নজরুলের লেখাকে স্মরণ করে :

> .... তারপর রবীন্দ্রনাথের পত্র আছে, সেই 'বাঁধন-হারা'র উজ্জ্বল মাধুর্য্য, আরও অনেক রত্ন এবারকার শ্রাবণ সংখ্যার মণি-কোষে আছে।

একটি কবিতা ছাড়াও ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৩২৭) মাসিক 'নারায়ণে' 'নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ' বিভাগে ১৩২৭ সনের আশ্বিন সংখ্যা 'সবুজপত্র' থেকে 'বীরবলে'র 'গত কংগ্রেস' লেখাটি এবং একই বছর ভাদ্র সংখ্যা 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা'র অংশ-বিশেষ পত্রিকার ৯৪ ও ৯৫ পৃষ্ঠা জুড়ে মুদ্রিত হয়েছিলো। এই মুদ্রণের কারণ কি তার ব্যাখ্যা আছে ওই সংখ্যা 'নারায়ণে'র 'নারায়ণের নিকষ-মণি' বিভাগে। 'নারায়ণের নিকষ-মণি'তে মূলত গ্রন্থ ও পত্রিকা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পায়। 'মোস্‌লেম ভারত' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচক 'বাঁধন-হারা' প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> .... তাহার পর হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম 'বাঁধন-হারা'। নজরুল ইসলাম অরূপ রসের কবি তাহা জানিতাম, এবারকার 'বাঁধন-হারা'র গোড়ায় তাহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর। কোন রস যদি অধিক হইয়া মাত্রা ছাড়ায়, ছবি আঁকিতে রঙ যদি বেশি পড়িয়া যায়, লাজের অপাঙ্গে যদি বিলোল কটাক্ষ আসে,

> তাহা হইলে কবিত্বের হানি হয়। গোড়ায় তাহায় ঘটিয়াছে, কিন্তু কোয়াটার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রঙ কোথাও বেশি পড়ে নাই। তাহার পর আবার সেই রূপ-অরূপের ভাবের রস! সেই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথাও নয়। এ অংশটুকু আমাদের পঞ্চপ্রদীপের ঘৃতের জোগান দিতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এই 'পঞ্চপ্রদীপ' হচ্ছে 'নারায়ণ' পত্রিকার আর একটি বিভাগ—যার শিরোনাম 'নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ'। এখানে উল্লেখযোগ্য রচনা বিভিন্ন সাময়িকী বা পত্রিকা থেকে অংশ-বিশেষ মুদ্রণ করা হতো। এই সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন-হারা' থেকে সুদীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত করা আছে।

মাসিক 'নারায়ণে'র ৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩২৯) 'নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ' শিরোনামে 'প্রবাসী' পত্রিকা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতার নিচে 'প্রবাসী' কথাটি ছাপা হলে কোন সংখ্যা বা বর্ষ সংখ্যা কত তার কোন কিছু উল্লেখ ছিলো না। এই একই সংখ্যায় 'নারায়ণের নিকষ-মণি' শিরোনামে গ্রন্থ-পত্রিকা আলোচনা বিভাগে নজরুলের 'ব্যথার দান' গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর গল্পগুলোর প্রশংসার পাশাপাশি নজরুলের গদ্যে যে কাব্যময়তা ছড়িয়ে আছে সে কথাও বলা হয়েছে :

> ব্যথার দান লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা, দাম দেড় টাকা। কলেজ স্কয়ার ইষ্ট, কলিকাতা মোস্‌লেম পবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা সৈনিক কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ, তাঁরা এই বইখানা পড়ে দেখবেন কবির গদ্য লেখা কেমন মনমাতান। এ বইখানা ছটি গল্পের সমষ্টি, শুধু গল্প না বলে কাব্য-গল্প বললেই ঠিক বলা হবে। কারণ এ গল্পগুলির মধ্যে কাব্যের মত মানুযের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে বইখানা পড়বার পর পাঠকের মনে একটা আবেশময় ঝঙ্কার রেখে যায়। 'হেনা' ও 'বাদল বরিষণে' এ দুটো গল্প চমৎকার, এ দুটোর মধ্যে যে, একটা ব্যথা ও করুণ সুর ফুটেছে, তার ঝঙ্কারে মনকে বিহ্বল করে ফেলে, সে সুরের মূর্চ্ছনা থেমেছে 'রাজবন্দীর চিঠি' এই গল্পে। বইখানা যিনিই পড়বেন, তিনি এর লেখবার ভঙ্গীতে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবেন না! সমালোচনা করে এর মাধুর্য্য বোঝান যায় না, সুতরাং দেড় টাকা খরচ করে নিজেকে পড়তেই হবে।

মোস্‌লেম ভারত

'মোস্‌লেম ভারত' ও কাজী নজরুল ইসলামের খ্যাতি প্রায় একই সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে। কবির প্রশংসা করে নানা চিঠিপত্র ও কবিতা-ছড়া যেমন প্রকাশ পায় - বিভিন্ন সাময়িকপত্রে, তেমনি এ সময়ই খানিকটা নজরুল বিরোধীও হয়ে পড়েন কেউ কেউ। তাদের পরিচালিত পত্রিকা-সাময়িকীতে নজরুলের বিরূপ সমালোচনা করে নানা নিবন্ধ, চিঠিপত্র, গল্প-কবিতাও ছাপা হয়। 'মোস্‌লেম ভারতে' 'চিঠিপত্র' বা এ ধরনের কোন বিভাগ না থাকায় চিঠির আকারে গদ্যে যদি, বা অনুরক্ত পাঠক প্রকাশিত কোন রচনা সম্পর্কে তাঁর মতামত সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রেরণ করতে চাইতেন- এই মতামত সাময়িকীর পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে জনসমক্ষে আসার সাধরণ কোন পথ ছিলো না। তবে ব্যতিক্রম সম্ভবত কবি মোহিতলাল মজুমদারের ক্ষেত্রে। অবশ্য তাঁর প্রধান লক্ষ্য নজরুল ইসলামের কবিতা হলেও তিনি মোস্‌লেম ভারতের সার্বিক দিক নিয়ে মতামত জানিয়ে চিঠি লিখেন সম্পাদকের কাছে। 'একখানি পত্র' শিরোনামে ওই চিঠিটি সাময়িকীর ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩২৭) প্রকাশিত হয়। ওই চিঠি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিশেষ অংশ নিচে তুলে ধরা হলো :

> কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতার শব্দার্থময়ী কণ্ঠভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদস্পন্দনের সহচর না হইয়া, ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণপ্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বরসপ্তকের সেবক হইয়াছে। কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাবকল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্ব্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রা বিন্যাস ও যতি বৈচিত্র্য প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে ; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই ; ছন্দ যেন

ভাবের দাসত্ব করিতেছে – কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই - এই প্রকৃত কবি-শক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণগম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ-বিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব —

আবুবরক উস্‌মান উমর আলী-হাইদর
দাড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান-'লা শরীক আল্লাহ্‌!

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে ; – বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য— 'লা শরীক আল্লাহ্‌'- যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য-যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে।

'বাদল প্রাতের শরাব' শীর্ষক কবিতায় ইরাণের পুষ্পসার ও দ্রাক্ষাসার ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। এ কবিতাটীতেও কবির 'মস্ত' হইবার ও 'মস্ত' করিবার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। বাঙ্গালী মাত্রেই ইহার উচ্ছল রসাবেশ অন্তরে অনুভব করিবে। কবির লেখনী জয়যুক্ত হউক।

পরিশেষে একটি বিনীত নিবেদন আছে। যে সকল ফার্সী শব্দ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আচার প্রথার সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেগুলি না থাকিলে মুসলমান জীবনে বাস্তব চিত্র বঙ্গ সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিবে না, এবং অনেক স্থলে যে শব্দগুলিই ভাষার একটী ভঙ্গীরূপে পরিগণিত হইবে— সেইগুলিকে আমাদের মত নিরক্ষর হিন্দু পাঠকের বোধগম্য করিবার জন্য (অন্ততঃ প্রথম কিছুদিন) কি উপায় করিতে পারেন?

কাজী নজরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি কবিতা 'মোস্‌লেম ভারতে' প্রকাশিত হয়। সাময়িকীটির ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যার (কার্তিক ১৩২৭) ৪৩৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় নজরুল উদ্দেশে প্রেরিত 'পত্র' শিরোনামের সুধাকান্ত রায়-চৌধুরীর

কবিতাটি। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত সচিব ছিলেন। নিচে কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেলো :

পত্র

(সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের প্রতি)

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুগ্ধ কর বিশ্বজনে দাও গো নূতন প্রাণ!
দমকে চলা হাওয়ার মত ছন্দ তোমার চলে
মাড়িয়ে দিয়ে সকল বাধা ক্ষিপ্ত চরণ-তলে।
যৌবনেরি জীবন দিয়ে বৃদ্ধে তরুণ কর,
রাগ-রসেরি পরশ দিয়ে চিত্ত অরুণ কর।
'সে-কাল'-বুড়র অধর-সীমায় মদের পাত্র ধরি'
তোমরা তারে 'এ-কাল' কর, মাতাও নূতন করি।
সমাজবিশেষ নয়, তোমাদের জীবন-নদীর বাধা,
তোমার বীণায় বিশ্ব-গানের সকল সুরই সাধা!
তোমার গানের সুরের তাতে অসাড় মরণ জাগে,
বেরসিকের হৃদয় ভরে প্রণয়ের অনুরাগে।
বন্ধুজনের প্রীতির মালা তোমায় দিলেম আজ,
পরবে কি গো এ? নাই যে এতে পান্না-চুনির কাজ!
মহব্বতের ফুলের শ্বাস এই মালাতে আছে,
খোস-বু তাহার পৌঁছে দিনু ছন্দে তোমার কাছে।

মোস্‌লেম ভারতে'র ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২৮) কাজী নজরুল ইসলামকে উদ্দেশ্য করে দুটো লেখা প্রকাশ পায়। এর একটি শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্ন-বাণী', অন্যটি শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের 'বিদ্রোহী বীর'। প্রথমটি

ছোটগল্পের ঢঙে কাব্যময় ভাষায় পরিবেশিত। এর শুরুতে 'দুখু' সম্বোধন আছে। দ্বিতীয় লেখাটি একটি কবিতা। সুদীর্ঘ কবিতাটিতে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে শিরোনামই শুধু নয়, প্রকরণগত সাদৃশ্যও লক্ষ্যযোগ্য। 'বিদ্রোহী বীর' কবিতাটিতে নজরুল ও তাঁর রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। শৈলেন্দ্রকুমার কবিতাটিতে নজরুলকে বহু-বিশেষণে সম্বোধিত করেছেন। এতে 'কামালপাশা', 'আগমনী', 'মহররম', 'হাফিজের গজল', 'বাদল বরিষণে', 'পূবের হাওয়া' ইত্যাদি কবিতা ও গল্পের প্রসঙ্গ এসেছে।

বাঙ্গলার কথা

'বাঙ্গলার কথা'য় নজরুল প্রসঙ্গ বিষয়ক কোন রচনা মুদ্রিত হয়নি। কারণ ক্ষীণাবয়ব এ সাপ্তাহিকীটি ছিলো পুরোপুরি রাজনৈতিক এবং এতে সাহিত্য-আলোচনা বা উদ্ধৃতির কোন পৃথক বিভাগ ছিলো না। তারপরও ওই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার উদ্ধৃতি দিতে দেখা যায়। সমকালীন লেখক কর্তৃক উদ্ধৃত হওয়া অবশ্যই প্রশংসনীয়। পত্রিকাটির ১ম ভাগ ২০শ সংখ্যায় (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২) প্রকাশিত হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-ভ্রাতা সুকুমাররঞ্জন দাশের 'আজব ব্যাপার' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত প্রবন্ধটি সমাপ্ত করা হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার ছয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে। নিচে প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরা হলো :

> .... এই সব 'হুক্কা হুয়া'র মধ্যে সারজন রিসের বক্তৃতাটাই একটু বেসুরা,— তাই তাতে দেখি তিনি বলছেন - গান্ধীকে অবরুদ্ধ করলে, তাঁর শক্তি মুক্ত অবস্থার চেয়ে ঢের বেড়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবাসীর প্রাণের কথাটা এপারে বা সাগর পারে ইংরাজেরা কেউ ভাল করে ধরতে পারে নি ; তা হলে বুঝতে কষ্ট হত না, ভরতবাসীর মন কেবল শাসানির চাপে থেকে থেকে আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, সে এখন বলে উঠেছে—
>
> বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
> আমি সেই দিন হব শান্ত ;

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন ধ্বনি আকাশে বাতাসে মিশিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভুমে রণিবে না ;
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
অমি সেই দিন হব শান্ত।

এই উদ্ধৃতি যে স্মৃতি থেকে দেয়া হয়েছে তার প্রমাণ উল্লিখিত তৃতীয় পঙ্‌ক্তির শব্দগত অসামঞ্জস্য দেখেই বুঝা যায়। এ থেকে আর যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তাহলো, সমকালে কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো এবং অনেকে এত দীর্ঘ কবিতাটি মুখস্থই করে ফেলেছিলেন। সুকুমাররঞ্জন দাশ যে কবিতাটি প্রায় মুখস্থ করেছিলেন তার প্রমাণ স্মৃতি থেকে দেয়া এই উদ্ধৃতি।

নজরুল : প্রসঙ্গ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্যেই হলো কোন কিছু জনসাধারণের গোচরীভূত করা। ইদানীং প্রচারযন্ত্র যেমন বেড়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে বিজ্ঞাপনের রকমফের। তারপরও সাহিত্য জগতে যাঁদের পদচারণা তাঁদের প্রচার মাধ্যম এখনও প্রায় সীমিতই রয়ে গেছে। পত্রিকা বা সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন ছেপেই তাঁদের প্রচারটা আজো সিংহভাগ হয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথের সময় যেমন দেখা গেছে সমকালীন পত্র-পত্রিকাতে তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন ছাপা হতে, কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ঠিক তেমনি। পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন এবং তার ভাষা দেখে কিন্তু খানিকটা হলেও অনুধাবন করা যায় যে, কোন লেখক বা তাঁর গ্রন্থ ওইকালে গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসার কেমন ছিলো। এখানে যে তিনটি পত্রিকাকে ('নারায়ণ', 'মোস্‌লেম ভারত', 'বাঙ্গালার কথা') অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলো যখন প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন নজরুল ইসলামের লেখক-স্বীকৃতি ততটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওই অবস্থাতেও পত্রিকা তিনটিতে তিনি বিজ্ঞাপনের ভাষায় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন তার মূল্য বিশেষভাবে দিতে হয়।

নারায়ণ

'নারায়ণ' পত্রিকায় কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কোন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতে দেখা যায় না। তবে নজরুল সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছাপা হয় পর পর দু'টি সংখ্যায়। নিচে 'নারায়ণে'র ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩২৯) থেকে ওই পত্রিকা সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করা গেলো। সংখ্যাটির চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষ অর্ধাংশে এটি মুদ্রিত হয়েছে। এই একই বিজ্ঞাপন বোধকরি 'ম্যাটার' না ভেঙ্গেই পরবর্তী ৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩২৯) ওই পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনটি এ রকম :

'আবার যুগান্তর আবার বিদ্রোহ বিপ্লব

লইয়া

"ধূমকেতু"

সপ্তাহে দুইবার করিয়া দেখা দিবে।

সারথী – 'বিদ্রোহী'র সৈনিক-কবি

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম

'ধূমকেতু'-কেন্দ্র – ৩ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা।'

পত্রিকাটির ৮ম বর্ষ ১১শ-১২শ যুগ্ম সংখ্যায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৯) ছাপা হয়েছে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপথা' উপন্যাসের একটি বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি 'বিপথা' সম্পর্কে প্রধান প্রধান পত্রিকার আলোচনা ও মন্তব্য দিয়ে তৈরি। 'ধূমকেতু' যেহেতু নজরুল সম্পাদিত পত্রিকা, সে বিবেচনায় ওই পত্রিকা থেকে গৃহীত বিজ্ঞাপনের অংশটুকু এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

> 'যতীনবাবুর 'বিপথা' পারিবারিক উপন্যাসখানা 'ধূমকেতু' কেন্দ্রে পেয়ে দিন কয়েক বেশ হুলো-হুজুক করে কাটান গেছে। উপন্যাসটিতে এমন একটা তীব্র উন্মাদনা, রোমান্স আছে যা আমাদের মত ক্ষ্যাপার দলকে স্পষ্টতঃই ক্ষেপিয়ে তোলে। যতীন্দ্রবাবুর সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী আখ্যানটি এমনি চটকদার হয়েছে যে, ভয় হয়, পাছে সমালোচনা করতে গিয়ে মৌলিক সৌন্দর্য্যের একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে না বসি। ....
>
> তারপর ঘটনার পর ঘাত প্রতিঘাতে পাঠকমাত্রকেই একটা বৈদ্যুতিক বেগে একটানে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়।

বইখানিতে আসামের প্রাকৃতিক বর্ণনায় প্রাণের চোক যেন জুড়িয়ে দেয়। যতীন্দ্রবাবুর চোক আছে তাই দেখতে জানেন, প্রাণ আছে তাই সরল ভাষায় বলতে জানেন।

ছাপা বাঁধাই, ছবি ইত্যাদি নিয়ে বইখানি যেন পূজোর বাড়ীর আদরিণী মেয়ের মত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার বহু চিত্র সাজিয়ে পূজোর 'ডালি' হাতে তুলে দিচ্ছেন।

'ধূমকেতু'

৫ই আশ্বিন ১৩২৯'

মোস্‌লেম ভারত

'মোস্‌লেম ভারত' সাহিত্য সাময়িকীটির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার (কার্তিক ১৩২৮) ৯ থেকে ১২ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাব্যাপী 'দি ন্যাশনাল জর্নাল্‌স্‌ লিমিটেড' নামে একটি কোম্পানি গঠন করে বাংলা প্রভাতী দৈনিক 'নকীব' ও তার সহযোগী একাধিক পত্রিকা বের করার জন্যে শেয়ার ক্রয়ের আহবান জানানো হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে ২রা ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজি Prospectus-এর বঙ্গানুবাদ। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় নীতি হিসেবে উল্লেখ ছিলো : "কোম্পানীর প্রকাশিত কাগজের মত সাধরাণতঃ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও অল ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগ এর মতের অনুযায়ী হইবে। কিন্তু আবশ্যক বোধ করিলে কোম্পানীর কাগজ লীগ ও কংগ্রেসের নির্ভীক সমালোচনা করিতেও ছাড়িবে না।" কোম্পানিটির সাতজন ডিরেক্টরের মধ্যে ছয় ক্রমিক নম্বরে কাজী নজরুল ইসলাম ও সাত ক্রমিকে মুজফ্‌ফর আহমদের নাম ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনটিতে নজরুলের নাম সর্বমোট তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে।

পত্রিকাটিতে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা, গান, গল্প ও কিস্তি ভিত্তিতে উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্পগ্রন্থ, 'ব্যথার দান'-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 'ব্যথার দান' প্রকাশ পায়, 'মোস্‌লেম ভারত' সম্পাদক মোজাম্মেল হকের প্রতিষ্ঠান 'মোস্‌লেম পব্লিশিং হাউস' থেকে। হয়তো এ জন্যেই গ্রন্থটির তিনটি বিজ্ঞাপন তিনভাবে সাময়িকীটিতে ছাপা হয়েছে, যার মধ্যে ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যার (পৌষ ১৩২৮) বিজ্ঞাপন খুবই মনলোভা। সাময়িকীটির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৩য় সংখ্যার

(কার্তিক ১৩২৮) দ্বিতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় 'মোস্‌লেম পব্লিশিং হাউস' থেকে প্রকাশিত আরও কতিপয় গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম মুদ্রিত কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন। 'ব্যাথার দান' ছাড়াও কাজী আবদুল ওদুদের উপন্যাস 'নদী-বক্ষে' মোজাম্মেল হকের উপন্যাস 'জোহ্‌রা' (২য় সংস্করণ), কবিতা গ্রন্থ 'জাতীয় ফোয়ারা', শিশুতোষ জীবনী গ্রন্থ 'হাতেম চাই', পাঠ্য-পুস্তক 'মক্তবের বর্ণ-শিক্ষা' ও 'মক্তবের বাঙ্গালা শিক্ষা' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্যথার দান' সম্পর্কে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষা এ রকম ঃ

নতুন পুস্তক ! নতুন পুস্তক ! !

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, মোস্‌লেম ভারত, উপাসনা, নারায়ণ, সন্দেশ, মৌচাক প্রভৃতি সুবিখ্যাত মাসিকপত্রের নামজাদা লেখক

সৈনিক-কবি

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত

– ব্যথার দান –

প্রাণস্পর্শী রসাল গল্পগুচ্ছ। কবির সৈনিক-জীবনে লিখিত উদ্দাম প্রাণের উচ্ছ্বল রসাবেশে এই

ব্যথার দান !

কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঔপন্যাসিক শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বনামধন্য সমালোচক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ যাঁহার লেখার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার প্রতিভা ও কবিত্ব-শক্তিতে বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান সুধিবৃন্দ বিমুগ্ধ, যিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার পুস্তক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের বাহ্যড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

ছাপা, কাগজ, বাঁধাই নয়নরঞ্জন, মূল্য ১।। দেড় টাকা মাত্র। মোস্‌লেম ভারত'-এর গ্রাহকগণ কিছুদিনের জন্য মাত্র পাঁচ সিকায় পাইবেন। গ্রাহকগণ সত্বর হউন।

সাময়িকীটির ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ ও ৫ম উভয় সংখ্যার দ্বিতীয় প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় উপরি-উক্ত বিজ্ঞাপনটি অবিকল প্রকাশিত হয়েছে।

'মোস্‌লেম ভারত' ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যার (পৌষ ১৩২৮) 'বিজ্ঞাপন' পৃষ্ঠা

দশ–এ কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন ছাপা হয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে। সাত দফায় বিভক্ত এই বিজ্ঞাপন পর্বে মীর মশাররফ হোসেনের, 'বিষাদ-সিন্ধু', কবি মোজাম্মেল হকের তিনটি গ্রন্থ, 'জোহরা', 'জাতীয় ফোয়ারা' ও 'হাতেম তাই', ডাক্তার লুৎফর রহমানের 'পথহারা' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। 'ব্যথার দানে'র বিজ্ঞাপন প্রকাশ পেয়েছে ষষ্ঠ দফায়। এই গ্রন্থের সঙ্গেও কাজী আবদুল ওদুদের 'নদী–বক্ষে' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন একই দফায় ছাপা হয়। উল্লেখ্য, 'মোস্‌লেম ভারত'–এর গ্রাহকগণের জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ' শিরোনামে বিশেষ ছাড়ে গ্রন্থগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এই সাত দফার বিজ্ঞাপন দান করেন। 'ব্যথার দান' সম্পর্কে শুধু এটুকু ছাপা হয়েছিলো :

'কাজী নজরুল ইসলম প্রণীত

১। ব্যথার দান — ১।। টাকা'

পত্রিকায় ওই একই সংখ্যার ১১ ও ১২ সংখ্যক বিজ্ঞাপন–পৃষ্ঠাব্যাপী আরও একটি একক মনোলোভা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে 'ব্যথার দান' গ্রন্থটির। একটি দর্শনীয় ব্লকে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটির ভাষা এরকম :

"হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত

নূতন পুস্তক।।

চমৎকার ভাষা— নৃত্যদোদুল ছন্দ

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য-সৃষ্টি!

সুন্দর–সুদৃশ্য–মনোরঞ্জক বাঁধান বই!

মূল্য দেড় টাকা ; 'মোস্‌লেম ভারত'–এর গ্রাহকগণ কিছুদিন ১।. পাঁচ সিকায় পাইবেন।"

"কাজী সাহেবের ঔপন্যাসিক প্রতিভা অসাধারণ। তাঁর লিখিবার ভঙ্গিমা চমৎকার। আলোচ্য বইখানিতে তাঁহার লেখনীর সেই চমৎকারিত্ব ও অসাধারণত্ব অক্ষুণ্ন আছে। বইখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অতি সুন্দর।" — দৈনিক মোহাম্মদী

'বঙ্গবাসী' বলেন —

"প্রেমের এবং বিরহের, আবেগের এবং আশঙ্কার, নায়ক এবং নায়িকার নানারূপ বিচিত্র মনোভঙ্গী রঙ্গিন তুলিকায় চিত্রিত। প্রেমোন্মাদ এবং ভাবোন্মাদের

বিচিত্র ভঙ্গির ন্যায় ভাষাও ইহার বিচিত্রভঙ্গীশালিনী ; রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরণনে অনুরঞ্জিনী। প্রেম ও বিরহ ভাবের ভাবুক 'ব্যথার দানে' অনেক সান্ত্বনা পাইতে পারিবেন।"

'THE SERVANT' বলেন—

"This little book evinces the author as a chivalrous hero attempting to conquer the subtle corners of the human heart. Moreover the style is all his own permeated with a freshness, vigour and impetuosity characteristic of his age and hopes."

'স্বরাজ' বলেন —

"কাজী নজরুল ইস্‌লাম এতদিন কবিতা লিখিয়াই যশ অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু গদ্যের জন্যও যে তিনি পুরাদস্তুর সাধনা করিয়াছেন, এই গ্রন্থখানিতে তাহার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। গদ্যের ভিতরেও যে একটা ছন্দ আছে, একটা মাত্রা আছে, কাজী নজরুলের এই বইখানি পড়িলে তাহা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এক কথায়, বইখানির ভাষা ছন্দময়। প্রকৃতির ভিতরকার রূপ এবং রস পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখার ভিতর একটা উদ্দামতার ছাপ সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার সাহসী এবং নির্ভীক। কনভেনসন বা অন্ধ সংস্কারকে তিনি পদে পদে দলিয়া চলিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে লেখকের একখানা প্রতিকৃতি আছে। ছাপা কাগজ বাঁধাই সমস্তই সুন্দর ও অনিন্দ্যনীয়।"

'বসুমতী' বলেন —

"কাজী নজরুল বাঙ্গলার সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। বাঙ্গলা কবিতা রচনায় তাঁহার যথেষ্ট সুনাম আছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে এক অভিনব রসসঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গলা গদ্যেও সিদ্ধহস্ত, তাহা জানা ছিল না। কাজী নজরুলের এই গদ্য রচনার মধ্যেও একটু মৌলিকতা আছে। ইহার ভাব ও ভাষায় প্রাণ আছে। বাঁধাই ও ছাপা ভাল।"

'আত্মশক্তি' বলেন —

"কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা প্রতিভাবান নবীন কবি বলিয়াই জানিতাম। তাঁহার এ বইখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে গদ্য সাহিত্যেও তিনি সমান কৃতী। ভাষা ও

ভাব কবিত্ব-মাখা। বাঁধাইও অতি সুন্দর।"

'বিজলী' বলেন —

"গ্রন্থকার বাংলার সাহিত্যে সুপরিচিত কবি। তবে এখানা কবিতার বই নয়। কবিতার বই না হলেও বইয়ের প্রতি পংক্তি কাব্যরসে ভরপুর। তাই বইখানা পড়তে হলে গ্রন্থকারের কাব্যরসের মাধুর্য্যের স্পর্শই বেশী পাওয়া যায়। বইখানা 'ব্যথার দান' কেন জানি না, কিন্তু প্রতি গল্পতেই একটা বেদনার রাগিনী করুণ রসে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। সে সুরটী যেন কবির হৃদয়-বীণার স্বতঃউচ্ছ্বসিত আবেগ-প্রসূত। আমরা বইখান পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি।"

'নবসঙ্ঘ' বলেন —

"কাজী সাহেব কবিতা লিখে বাংলা পাঠকদের মন হরণ করেছেন। তিনি একজন উঁচু দরের কবি- এখন আর পরের রচা পথে তিনি বিচরণ করেন না, তিনি নিজেই নিজের পথ করে নিয়েছেন। 'ব্যথার দান' পড়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। ওস্তাদের গান থেমে গেলেও যেমন তার সুরের রেশ মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, তেমনি গল্পগুলি শেষ হয়ে গেলেও গল্পের ভিতরকার করুণ রসটী আমাদের অন্তরের তারে ঘা দিয়ে ব্যথার ঝঙ্কার তোলে।"

উপরি-উক্ত উভয় বিজ্ঞাপনই বর্তমান সংখ্যাটির অব্যবহিত পূর্ব সংখ্যাতেও ছাপা হয়। উল্লিখিত প্রথম বিজ্ঞাপনটি উভয় সংখ্যাতে একইভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটি ২য় বর্ষ ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ ১৩২৮) এতোটা বিস্তৃত ছিলো না। তাতে 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত পর্যন্ত উল্লেখ ছিলো, 'বসুমতী', 'আত্মশক্তি', 'বিজলী' ও 'নবসঙ্ঘ' পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত পরবর্তী সংখ্যায় (৫ম সংখ্যা) সংযোজন করা হয়।

বাঙ্গলার কথা

কাজী নজরুল ইসলামের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' বের হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে। এ কারণে আলোচ্য পত্রিকাগুলোতে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'ব্যথার দানে'র বিজ্ঞাপনই ছাপা হতে দেখা যায়। 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকার ১ম ভাগ

২২শ সংখ্যার (১০ মার্চ ১৯২২) সর্বশেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় নজরুলের প্রথম প্রকাশিত ওই গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন। এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছয়টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে 'ব্যথার দান' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনটি ক্ষুদ্র কিন্তু সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণকারী। বিজ্ঞাপনের ভাষা এরকম :

"নূতন পুস্তক ! নূতন পুস্তক ! !

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত

ব্যথার দান

রসাল গল্পোপন্যাস

সুন্দর-সুদৃশ্য-মনোরঞ্জক বাঁধানো বই ! !

মূল্য ১।।. দেড় টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান : মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস

কলেজ স্কয়ার (ইস্ট), কলিকাতা।"

উল্লিখিত সংখ্যাটির ঠিক পরের সংখ্যা 'বাঙ্গলার কথা'য় এই বিজ্ঞাপন একইভাবে যথাস্থানে মুদ্রিত হয়। অন্য পাঁচটি বিজ্ঞাপনও পূর্ববৎ থাকে।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলামের সমকালে প্রকাশিত তিনটি পত্রিকা 'নারায়ণ', 'মোস্‌লেম ভারত' ও 'বাঙ্গলার কথা'য় মুদ্রিত কবির কবিতাগুলো পরবর্তীকালে যখন গ্রন্থভুক্ত হয় - দেখা গেলো, তাতে অনেক ক্ষেত্রেই পাঠভেদ ঘটেছে। এই পাঠান্তরগুলো কিছুটা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে হয়েছে সত্য ; যেমন, 'মোহর্‌রম', 'ইন্দ্রপতন' ইত্যাদি - কিন্তু অধিকাংশ করা হয়েছে কাব্যধর্মের তাগিদে। এখানেই নজরুলের আঙ্গিক সচেতনতার পরিচয় মেলে। তাঁর সম্পর্কে একটি ধারণা প্রচলিত আছে, তিনি স্বতঃস্ফূর্ততাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, আঙ্গিকের কুশল পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ তেমন করেন নি। ইব্রাহীম খাঁ-কে একটি চিঠিতে নজরুল নিজেও লিখেছিলেন : 'আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে'।[২৯] নজরুল সম্পর্কে উপরি-উক্ত

২৯. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), *নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (নতুন সংস্করণ) ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৯৬

প্রচলিত ধারণা, কবির এই বক্তব্য থেকেও বোধকরি খানিকটা সমর্থন চায়। কিন্তু আমাদের বর্তমান বিশ্লেষণ ও আলোচনা এই ধারণাকে সমর্থন করে না। প্রথাবদ্ধ শিল্পরীতি তিনি অতিক্রম করেছেন সন্দেহ নেই, তবে নিজস্ব আর্টি-অভিলাষের সৌধও গড়েছেন কবি। যদি তা-ই না হতো, কাব্যাঙ্গিক সম্পর্কে যদি তিনি সত্যি হতেন 'মন উদাসী' তাহলে পত্রিকা থেকে গ্রন্থভুক্তির সময় কবিতায় নজরুল পাঠভেদ আনতেন না। অন্য দু'টো প্রসঙ্গ—পত্রিকায় নজরুল-আলোচনা ও বিজ্ঞাপন-অংশের ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। নবীন কবি নজরুল তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই যে কী গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যরসিকমহলে সে প্রমাণ এখানে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনে 'বঙ্গবাণী', 'স্বরাজ', 'বসুমতী', 'আত্মশক্তি', 'বিজলী', 'নবসঙ্ঘ' ইত্যাদি পত্রিকার উল্লেখ থেকে অনুমিত হয়, এই পত্রিকাগুলোর পুরাতন সংখ্যা অনুসন্ধান করলে নজরুল-প্রসঙ্গে আরও নতুন তথ্যের সন্ধান লাভ হয়তো সম্ভব।